

বাংলাদেশের জন্য নতুন সরকার ব্যবস্থার সন্ধান

ডঃ খন্দকার সিদ্দিক-ই-রস্বানী

অধ্যাপক, বায়োমেডিকেল ফিজিক্স এন্ড টেকনোলজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সূচনা

বাংলাদেশে নির্বাচনভিত্তিক দলীয় সরকার ব্যবস্থা দুঃখজনকভাবে একটি অচলাবস্থায় এসে ঠেকেছে। এর জন্য আমরা কখনও কোন ব্যক্তিকে, কখনও কোন গোষ্ঠীকে দায়ী করছি, কখনও সামগ্রিকভাবে নিজেদেরকে দায়ী করে বলছি যে আমরা গণতন্ত্রের জন্য উপযোগী নই, আমরা দুর্নীতিবাজ, আমরা অশিক্ষিত, আমরা খারাপ, ইত্যাদি। কিন্তু আশ্চর্য হই এই ভেবে যে কেউ বলছে না যে গণতন্ত্রের নামে যে পদ্ধতিকে আমরা আদর্শ হিসেবে চিন্তা করছি তারও কোন দোষ থাকতে পারে। আমি মনে করি আমরা বাঙালীরা মানুষ হিসেবে এত খারাপ হতে পারি না। তাহলে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে এ জাতি হাজার বছর টিকে থাকতে পারত না, বহু আগেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। গত ৫০/৬০ বছরে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো ঔপনিবেশিকতার হাত থেকে মুক্ত হয়েছে, এবং যারা গণতন্ত্রের এ পদ্ধতির পথে চলার চেষ্টা করেছে সবগুলোতেই কমবেশী প্রায় একই অবস্থা চলছে, বাংলাদেশের অবস্থাটি একটু চরমে। এমনকি পাশ্চাত্যের ধনী, শিল্পোন্নত ও গণতন্ত্রে অগ্রণী কোন কোন দেশেও রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঝগড়া বিবাদ বেড়ে যাওয়ার ও বিচার ব্যবস্থাকে দলীয় প্রভাবে নিয়ে আসার ব্যাপারগুলো লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তা ছাড়া তাদের মধ্যে কোন কোন দেশ নিজের জন্য আপাতঃদৃষ্টিতে ভাল হলেও গোটা পৃথিবীর জন্য বিপর্যয় ডেকে আনছে। আজ যেন গোটা পৃথিবীই ধীরে ধীরে অনাবাসযোগ্য এক পরিস্থিতির দিকে এগিয়ে চলেছে।

আমি মনে করি আজকে বাংলাদেশে যে দুঃখজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, যে সীমাহীন দুর্নীতি ও সন্ত্রাস দেখতে পাচ্ছি, বিবাদমান রাজনীতিবিদদের যে অনভিপ্রেত চরিত্র ও আচরণ দেখছি তা দলভিত্তিক ও ভোটনির্ভর গণতন্ত্রের কারণেই হয়েছে। অভিজ্ঞতার আলোকে আমি বিশ্বাস করি সামাজিক বা রাষ্ট্রীয়ভাবে গৃহীত পদ্ধতি মানুষের চরিত্রকেও সামগ্রিকভাবে প্রভাবান্বিত করে। প্রথমে আমি মৌলিক দৃষ্টিকোণ থেকে উপরের বক্তব্যের পক্ষে কিছু যুক্তি তুলে ধরব। তবে আমি মনে করি সমাধানের একটি বিকল্প পথ না দেখাতে পারলে কেবল সমস্যা তুলে ধরা উচিত নয়, যার জন্য বহু বছর ধরে আমি এর সমাধান খুঁজেছি। এ প্রচেষ্টায় কিছু নতুন ধারণা নিয়ে নানা মানুষের সঙ্গে আলাপ করেছি, প্রয়োজনে ধারণাগুলিকে পরিবর্তন ও পরিমার্জন করেছি। ধারণাটি এখন যে পর্যায়ে এসেছে, মনে হয় সবার সামনে তুলে ধরা যেতে পারে। হয়ত আলোচনা সমালোচনার মাধ্যমে প্রস্তাবিত বিকল্প পদ্ধতিটির ভুল ত্রুটি দূর করে একে আরও উন্নত করে বাস্তবে গ্রহণীয় পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যাবে, যার ফলে বাংলাদেশ, এমনকি হয়ত গোটা পৃথিবী বেঁচে ওঠার একটি নতুন দিক নির্দেশনা পাবে।

আমার মনে হয় প্রচলিত গণতন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী খারাপ দিকগুলো বাংলাদেশে যতটা প্রকাশ পেয়েছে পৃথিবীর আর কোথাও তা পায় নি। এর কারণ হিসেবে আমি মনে করি যে বাংলাদেশের মানুষ অত্যন্ত মেধাবী ও বুদ্ধিমান, তাই যে কোন ব্যবস্থা বা পদ্ধতির অন্তর্নিহিত অর্থটি সে খুব সহজে বুঝতে পারে, এবং পদ্ধতির ভাল বা মন্দ যে ফলাফলই হোক না কেন তা খুব তাড়াতাড়ি এখানে প্রকাশ পেয়ে যায়। হয়ত ইউরোপ আমেরিকায় যে ফলাফল পেতে শতাব্দী লেগে যাবে, বাংলাদেশে এক বা দু যুগেই তা প্রকাশ পাবে। তাই নতুন কোন ধারণা পরীক্ষা করে দেখার জন্য ও তার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিমার্জনের জন্য বাংলাদেশই সবচেয়ে ভাল পরীক্ষাগার। সফল হলে বাংলাদেশ থেকেই তা গোটা পৃথিবী উপহার পাবে। ইতিমধ্যে আমরা দেখেছি যে প্রচলিত গণতন্ত্রে বাংলাদেশই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণাটি উদ্ভাবন করেছে, এবং সারা পৃথিবী তা আগ্রহভরে দেখছে। তেমনি প্রচলিত গণতন্ত্রের ধারণাটিও যদি ভুল প্রমাণিত হতে হয়, তবে তা এবং তার বিকল্প ব্যবস্থার ধারণাটিও আসতে হবে বাংলাদেশ থেকেই।

এ পুস্তিকাটিকে আমি দুটো পর্যায়ে ভাগ করেছি।

১। বর্তমানে প্রচলিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটি ভুল, এবং এ ব্যবস্থাটিই মানুষকে পশুত্বের দিকে নিয়ে গিয়ে শুধু বাংলাদেশ নয়, গোটা পৃথিবীকেই আজ অনাবাসযোগ্য করে তুলেছে। দুর্নীতি, সন্ত্রাস যাই বলুন না কেন সবকিছুর মূল হচ্ছে এই দল ও নির্বাচনভিত্তিক গণতন্ত্র। – এ বক্তব্যের সমর্থনে প্রথম পর্যায়ে মৌলিক দর্শন ও বাস্তবতার ভিত্তিতে কয়েকটি যুক্তি তুলে ধরব। শেষের সংযোজন-১ অংশে এ বক্তব্যের সপক্ষে আরও কিছু যুক্তি ও অভিজ্ঞতাপ্রসূত বিশ্লেষণ তুলে ধরব।

২। পুস্তিকাটির দ্বিতীয় পর্যায়ে আমি একটি বিকল্প রাষ্ট্র ব্যবস্থার ধারণা তুলে ধরব। স্বাভাবিকভাবে গড়ে ওঠা মানব সমাজের অভিজ্ঞতাকে সামনে রেখেই আধুনিক রাষ্ট্রের জন্য একটি ব্যবস্থার ধারণা তুলে ধরেছি এতে। বাংলাদেশকে সামনে রেখেই এ প্রস্তাবনা। তবে এর উপর আরও চিন্তা ভাবনার প্রয়োজন আছে। প্রাথমিকভাবে পছন্দ হলে সবাই মিলে চিন্তাভাবনা করে পদ্ধতিটিকে আরও উন্নত করে বাস্তবে প্রয়োগ করার চেষ্টা নেয়া যেতে পারে। শেষের সংযোজন-২ অংশে নতুন এ ব্যবস্থার উপর কিছু সম্ভাব্য প্রশ্ন ও তার উত্তর লিপিবদ্ধ করব।

১ম পর্যায়

প্রচলিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভুল

বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে আমি বিশ্বাস করি একটি ভুল রাষ্ট্রপদ্ধতি মানুষের সামগ্রিক ব্যবহার ও চরিত্রকে পাল্টিয়ে দিতে পারে। আজ যারা রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত অশোভন আচরণ করছেন, এমনকি জনগণের চোখে অনেকসময় ঘৃণ্য আচরণ করছেন, তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যদি মিশে থাকেন দেখবেন তাদেরও একটি সুন্দর মন আছে, নিজস্ব পরিমন্ডলে তারা খুবই ভাল মানুষ, একসময়ে সত্যিকারেই দেশের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন। হয়ত নিভৃতে তাদের প্রত্যেকেই ভাবছেন কেন এমন নীচে নেমে গেলাম, কেন এরকম আচরণ করলাম। পরিবেশের আবর্তে পড়ে গেলে ভাল মানুষও অনেক সময় খারাপ আচরণ করে ফেলে। রাজনীতিতে জড়িয়ে গেলে হয়ত আমি আপনিও সে একই অপ্রিয় ও অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ করতাম।

কাছের একটি উদাহরণ দেই। কিছুদিন আগে পর্যন্তও আমাদের দেশে এস-এস-সি এবং এইচ-এস-সি পরীক্ষায় প্রথম, দ্বিতীয় ইত্যাদি অবস্থান ঘোষণা করা হত, এবং প্রায় এক দেড় যুগ ধরে পত্র পত্রিকাগুলো এ প্রথম দ্বিতীয় হওয়াটিকে এমন বাড়াবাড়িভাবে উপস্থাপন শুরু করল যে অল্প বয়স্ক ছাত্র-ছাত্রীদের মনে হতে থাকল যে এসব পরীক্ষায় প্রথমদিকে অবস্থান পাওয়াটাই জীবনের মূল লক্ষ্য এবং জীবন বিকিয়ে দেয়ার মত একটি প্রতিযোগিতা। এর ফলে দেখা গেল যে একই স্কুলে ভাল ছাত্রেরা পড়াশুনা নিয়ে পরস্পর কথা বলে না, কি জানি যদি অপরজন তার থেকে বিষয়টি সম্পর্কে জেনে পরীক্ষায় এগিয়ে যায়। কিছুটা দুর্নীতিও শুরু হয়ে গিয়েছিল। কোন বিষয়ে কে প্রধান পরীক্ষক থাকবেন খবর নিয়ে তার কাছে গিয়ে কিছুদিন হলেও কোচিং করে আসত এসব মেধাবী ছাত্রেরা, উদ্দেশ্য প্রধান পরীক্ষকের হাতে থাকা নম্বর বাড়ানো কমানোর ক্ষমতাটিকে যেন নিজের পক্ষে কাজে লাগানো যায়, কারণ দু-এক নম্বরই পরীক্ষার ফলাফলে অবস্থান পরিবর্তন করে দিতে পারে। অপর দিকে দেখুন, বর্তমানে থ্রেডিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের পরে আগের চরম প্রতিযোগিতাটি চলে গেছে। স্কুলের ভাল ছাত্রেরা এখন নিসঙ্কোচে পরস্পর কথা বলতে পারছে, কারণ সবাই একই সমান উচ্চ গ্রেড পেতে পারে। প্রধান পরীক্ষক খুঁজে কোচিং করার দুর্নীতিটিও চলে গেছে। তাই সিস্টেম বা ব্যবস্থা মানুষের চরিত্রকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এ ধারণাটি বোধ হয় অমূলক নয়।

আর একটি উদাহরণ দিচ্ছি। কিছুদিন আগে একটি পত্রিকার ম্যাগাজিন অংশে একজন লিখলেন যে দেশের মানুষ সব প্রতারক হয়ে গেছে। তিনি একদিন নিজ হাতে ভাল আপেল দেখে বেছে নিয়ে ঠোঙায় ঢুকিয়েছেন, কিন্তু বাসায় এসে দেখেন যে একটি পচা আপেল চলে এসেছে যা তিনি ঢোকান নি। তিনি সন্দেহ করছেন যে মানি ব্যাগ বের করার জন্য হয়ত একটু ঘুরেছেন, আর তখনই দোকানদার পচা আপেলটি ঢুকিয়ে দিয়েছে। এর প্রেক্ষিতে আমারও একটি লিখা ঐ পত্রিকায় ছাপা হয়। আমি লিখলাম যে আমার কিন্তু ভিন্ন অভিজ্ঞতা। আমি এ ধরনের কিছু কিনতে গেলে প্রথমেই দোকানদারকে বলি যে আমি নিজে দেখব না, তার বিশ্বাসের উপরই নির্ভর করব, তিনিই যেন ভাল দেখে নিজে বেছে দেন। লিখেছি যে বাসায় সুনাম আছে যে আমি ভাল জিনিস বাজার করি, আর তার মূলে রয়েছে ঐ বিশ্বাস। যখনই ছোট একটি কথা দিয়ে মানুষটির বিশ্বাসকে জাগিয়ে দেয়া যায়, তার পক্ষে তখন ঐ বিশ্বাস ভাঙা খুব কঠিন হয়ে যায়। অন্য লেখকের অভিজ্ঞতাকে বিশ্লেষণ করে লিখলাম যে নিজে হাতে বেছে নিতে গিয়ে তিনি সূক্ষ্মভাবে দোকানদারকে ইঙ্গিত দিয়ে ফেললেন যে তাকে তিনি বিশ্বাস করেন না। তাই দোকানদারও সুযোগ পেয়ে একহাত দেখিয়ে দিয়েছে। এখানে মজার ব্যাপার হল যে একই দোকানদার হয়ত আমাকে ভাল জিনিস দিচ্ছে, যেহেতু আমি তাকে বিশ্বাস করেছি ও তার ভিতরের ভাল গুণকে উজ্জীবিত করে দিয়েছি। কিন্তু যে তাকে বিশ্বাস করছে না, তাকে সে উল্টো ঠকিয়ে দিচ্ছে।

প্রচলিত দল ও নির্বাচনভিত্তিক গণতন্ত্র যে ভুল, এবং এর কারণেই যে আমাদের সব দুর্দশা সে ব্যাপারে মৌলিক দর্শন ও বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নীচে কিছু সুনির্দিষ্ট যুক্তি তুলে ধরছি।

১। নিজের জন্য ভোট চাওয়া পশুত্বের দিকে নিয়ে যায়, সন্ত্রাস ও দুর্নীতি দলভিত্তিক নির্বাচন ব্যবস্থার স্বাভাবিক পরিণতিঃ

আমরা কোন ধরনের সমাজ চাই? যেখানে থাকবে পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থা, এবং পারস্পরিক সম্মান। দোষে-গুণেই মানুষ, কিন্তু আমরা চাই যে দোষকে ছাপিয়ে গুণগুলো বিকশিত হোক। কল্পিত এ সমাজে এ জন্য আমি নিজের থেকে অপরকে ভাল হিসেবে দেখব ও চিন্তা করব, অপরের দোষগুলোকে ঢেকে রেখে তার গুণগুলোকে প্রকাশ করব। সেও একইভাবে আমার সঙ্গে ব্যবহার করবে। এর ফলে সমাজে গুণের চর্চা বাড়বে ও দোষগুলো আমাদের চরিত্র থেকে দূর হবে। এভাবে মনুষ্যত্বের উচ্চ পর্যায়ে ওঠার জন্য আমরা সবসময় সচেষ্ট থাকব। কিন্তু বর্তমান দলভিত্তিক ও ভোটনির্ভর ব্যবস্থায় আমাকে মূলতঃ বলতে হচ্ছে, “আমার পরিকল্পনা অপরের থেকে ভাল, আমি অপরের থেকে ভাল, আমাকে ভোট দাও।” আমার প্রতিদ্বন্দীও তার নিজের করে একই কথা বলবে। এ ব্যবস্থা স্বাভাবিকভাবেই আমাদেরকে একটি অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার মধ্যে নিয়ে যাবে।

এ প্রতিযোগিতায় কেউই হারার জন্য নামে না। শুরুতে আমরা যত ভাল মানুষই থাকি না কেন, একবার রাজনীতির ভোটের এ প্রতিযোগিতায় নেমে গেলে বলা হবে যে নাচতে নামলে আর ঘোমটা দিয়ে থাকা চলবে না। তাই একটু একটু করে আমরা দু পক্ষই পশুত্বের দিকে চলে যাব। প্রথমে আমরা দুজনই একে অপরের দোষগুলো বড় করে তুলে ধরতে থাকব, শুরু হয়ে যাবে কাদা ছোঁড়াছুড়ি। তারপর আমি ভোটারদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য বিভিন্ন প্রলোভন, বা স্থূলভাবে বলতে গেলে, ঘুষ দেব। আমি হাসপাতাল, পুল, স্কুল বানিয়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেব, আমার বিপক্ষীয় ব্যক্তি তা আরও বাড়িয়ে দেবে, আমি তার থেকে আরও বাড়িয়ে দেব। এক পর্যায়ে সরাসরি ভোটারকে ঘুষ দেব আমাকে নির্বাচিত করবার জন্য। প্রতিপক্ষ আরও বাড়িয়ে দেবে তা। সে প্রতিযোগিতায় পেরে না উঠলে ভয় ভীতি প্রদর্শন করব। প্রতিপক্ষও আরও বাড়িয়ে করবে, হয়ত কারও ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দেবে। এরপর আমি হয়ত কাউকে খুন করেই ভয় দেখানোর প্রতিযোগিতাটিকে আরও উপরের একটি পর্যায়ে নিয়ে যাব। প্রতিপক্ষও তাই করবে, হয়ত আরও ভীতিপ্রদ করে। আবার এসব করার জন্য প্রতিটি গ্রামে গ্রামে আমার ও প্রতিদ্বন্দী, দু পক্ষেরই লোকবল দরকার হবে। তারা খাবে কি? তাদেরকে বলব, “তোমরা নিজেরা ব্যবস্থা করে নিও”। সরকারের ক্ষমতায় থাকলে পুলিশকে বলে দেব যে “ওরা আমার লোক, ওদেরকে যেন ধরা না হয়।” তারা গ্রামে গ্রামে, রাস্তায় রাস্তায় চাঁদাবাজী করবে, মস্তানী করবে, ঠিকাদারের টাকায় ভাগ বসাবে। কারও সুন্দরী মেয়ে দেখলে ঘরে হানা দেবে। কেউ বাধা দিলে খুন করে দেখিয়ে দেবে। কোন পুলিশ বাড়াবাড়ি করে আমার লোকদের ধরলে তাকে কঠিন কোন জায়গায় বদলি করে দেব, নাহয় তাকে দুর্নীতির অভিযোগে ফাঁসিয়ে চাকুরী থেকে বের করে দেব। অন্যায়কে দেখেও চোখ বুজে থাকতে থাকতে এক পর্যায়ে পুলিশ ভাববে ভাল থেকে কি হবে? সেও চাঁদাবাজী-মস্তানী শুরু করবে। তাই দেখা যাচ্ছে সন্ত্রাস ও দুর্নীতি এ দলভিত্তিক নির্বাচন ব্যবস্থার স্বাভাবিক পরিণতি।

এ সব আমাদের চাক্ষুস অভিজ্ঞতায় দেখা নয় কি? এভাবে মানুষ থেকে পশুর পর্যায়ে নেমে এসে তারপরই আমরা দেশের নেতা হচ্ছি, দেশ পরিচালনার ভার নিচ্ছি। তাই আমি ব্যক্তিগত জীবনে যত উন্নত মানুষই হই না কেন, রাষ্ট্রযন্ত্রের ভুল পদ্ধতির আবর্তে পড়ে নিজের মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিতে বাধ্য হচ্ছি, পশুত্বের পর্যায়ে চলে যাচ্ছি। আর সেই পশুত্বের অবস্থান থেকে দেশ পরিচালনা করলে যা হবার তাই হচ্ছে। আমরা অনেকে মনে করি যে বর্তমানের সব গডফাদার ও সন্ত্রাসীদের শেষ করে দিলে, ভাল মানুষ রাজনীতিতে এলে দেশ ভাল চলবে। উপরের বিশ্লেষণ থেকে আন্দাজ করতে পারছেন, যদি দলভিত্তিক নির্বাচন ব্যবস্থা চলতে থাকে, তবে গডফাদার ও সন্ত্রাসী তৈরী হওয়া কেবল সময়ের ব্যাপার মাত্র। স্বাভাবিক নিয়মেই তা আবার তৈরী হয়ে যাবে। ভাল মানুষেরাও যে কিভাবে পাল্টিয়ে যাবে বুঝতেই পারব না।

২। উন্নত মানুষ কখনও নিজেকে নির্বাচনে দাঁড় করাতে চাইবেন না

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যারা সত্যিকারে নিজেদেরকে উন্নত মানুষ হিসেবে তৈরী করার জন্য সারা জীবন চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, যারা দেশকে সত্যিকারে নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্যতা রাখেন, তারা কখনোই নির্বাচনে নেমে নিজেকে আর একজনের প্রতিদ্বন্দীতায় নামাবেন না। বরঞ্চ তারা বলবেন, “অপরজন নেতা হোন, আমি তাকে সর্বতোভাবে সহায়তা দেব।” কারণ তাদের মনের ভিতরের এক সূক্ষ্ম হিসাব বলে দেয় যে এভাবে নির্বাচনে নেমে নিজেকে জাহির করা মনুষ্যত্ব নয়। তার সারা জীবনের শিক্ষার বিরোধী এ ব্যবস্থা। চিন্তা করে দেখুন তো, ইদানীং নোবেল বিজয়ী ডঃ মুহম্মদ ইউনুসকে তার ডাকা নতুন রাজনৈতিক দল গঠন থেকে কেন ফিরে আসতে হল? তিনি দেশের যেসব উন্নত, সং ও যোগ্য মানুষদেরকে সামনে রেখে এ ডাকটি দিয়েছিলেন, তারা কেউই এ ডাকে সাড়া দেয় নি। কারণ তাদের মনের ভিতরের ঐ হিসাব নিকাশ। নিজেকে যোগ্য ও ভাল বলে ঢাকঢোল পিটিয়ে, অপরজনকে হয়ে প্রতিপন্ন করে কথা বলতে তারা তৈরী নন। তাদের সারা জীবনের শিক্ষা ও জীবনবোধের সম্পূর্ণ বিপরীতে রয়েছে এসব কর্মকাণ্ড। কিন্তু তাদের কাউকে কেবল একজন যোগ্য ব্যক্তি হিসেবে যদি আহবান জানানো হয়, অন্য কারও তুলনায় বড় দেখিয়ে নয়, তাহলে তারা হয়ত রাজী হবেন দায়িত্ব নিতে। আর একবার দায়িত্ব নিলে তিনি জীবন দিয়ে হলেও দেশের সেবা করবেন, তার উপরে দেয়া বিশ্বাসকে শতভাগে পূর্ণ রাখার চেষ্টা করবেন। এ পর্যন্ত আসা তত্ত্বাবধায়ক সরকারগুলোর বেশ কিছু উপদেষ্টাদের মধ্যে আমরা এ চিত্রটি ইতিমধ্যে দেখেছি।

৩। একতাই বল, তবে দলে দলে ভাগ করা কেন ?

আমাদের হাজার বছরের শিক্ষা – ‘একতাই বল, বিভেদে পতন’। অথচ গণতন্ত্রের নামে দেশের মানুষকে দলে দলে বিভক্ত করে আমরা কি এ শিক্ষার উল্টো দিকে চলছি না? আবার দলে দলে বিভক্ত এসব রাজনৈতিক দলকে একসঙ্গে কাজ করতে বলছি, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্য নির্দলীয় ব্যক্তি খুঁজছি, সিভিল সোসাইটির নির্দলীয় মানুষ তৈরী হতে বলছি – এগুলো কি স্ববিরোধীতা নয়? ভিতরে আমাদের বিবেক ঠিকই বলছে যে নির্দলীয় মানুষ ভাল হয়, দলীয়করণ ভাল নয়, কিন্তু পাশ্চাত্যের ধারণাগুলোতে এমনভাবে নিজেদের সঁপে দিয়েছি বা তাতে এমনভাবে ফেঁসে গেছি যে দলে দলে বিভাজন মানুষকে খারাপ করে জেনেও শেষ পর্যন্ত তার দিকেই বার বার ফিরে যাচ্ছি।

সমাজের ভাল হয় এমন অনেক কাজ ইচ্ছা করেই দলীয় রাজনৈতিক সরকারগুলো বাংলাদেশে করে নি, যেমন বিচার ব্যবস্থা পৃথক করা, দুর্নীতি দমন কমিশনকে স্বাধীন ও শক্তিশালী করা। আমরা তত্ত্বাবধায়ক সরকারকেই তা করে দেয়ার জন্য বলছি, মনেও ভাবছি, সমাজের জন্য যা কিছু ভাল তা এ তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে দিয়েই করিয়ে নিতে হবে, কারণ ফিরে যাব তো সেই একই দলীয় অন্যায়ের রাজ্যে। যেন এক দুর্নিবার স্রোত আমাদেরকে নীচে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে, আমরা কেবল মাঝে মাঝে ছোটখাট খড়্‌ খুটো ধরে নীচে পড়ার গতিটাকে কমিয়ে দেয়ার চিন্তা করছি মাত্র। কিন্তু খেয়াল করুন, এ স্রোতটিকে তো আমরাই তৈরী করেছি, এটি বন্ধ করার চাবিটিও আমাদেরই হাতে। আরেকভাবে বলা যেতে পারে, ঘরে নিজেরাই পেট্রোল ছড়িয়ে দিয়ে আশা করে বসে আছি যেন আগুন না লাগে। আগুন জ্বলে ওঠার পরিবেশ তৈরী করে রাখলে কোন না কোন সময় একটি স্ফুলিঙ্গ এসে পড়বেই, তা ঠেকাবার কোন ব্যবস্থাই তখন থাকবে না। তাই আগুন যেন জ্বলে ওঠার পরিবেশই না থাকে সেদিকেই আমাদের দৃষ্টি দেয়া উচিত নয় কি? অর্থাৎ দেশের মানুষকে দলে দলে ভাগ করে দেয়ার এ ব্যবস্থা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতেই হবে।

এ প্রসঙ্গে একটি বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিন্ন একটি বিশ্লেষণ তুলে ধরা যেতে পারে। তৃতীয় বিশ্বের বেশীর ভাগ দেশগুলোতে দেখা যায় প্রচলিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা দেশকে দুর্নীতি, বিশৃঙ্খলা ও দুর্দশার দিকে নিয়ে যায়। এক পর্যায়ে সামরিক শাসন এসে দেশকে সে দুর্দশা থেকে আপাতঃ রক্ষা করে কিছুটা শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনে, কিন্তু সাথে সাথে আসে স্বৈরতন্ত্র। তারপর আবার সে গণতন্ত্রে ফিরে যায়, আবার সামরিক শাসন ও স্বৈরতন্ত্র আসে, একই অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে। তখন বলা হয়ে থাকে যে সামরিক শাসনের জন্য দেশটিতে

গণতন্ত্র উত্তরণ পেতে পারে নি। আমি কখনই সামরিক শাসনের পক্ষে নই, এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি সামরিক শাসন কখনই একটি দেশের উত্তরণ ঘটাতে পারবে না। কিন্তু এটি বোধ হয় বলা যায় যে সামরিক শাসনই তৃতীয় বিশ্বে গণতন্ত্র নামের সোনার হরিণের প্রতি মানুষের মোহটিকে টিকিয়ে রেখেছে। আজকে বাংলাদেশে বিভিন্ন কারণে সামরিক শাসন সরাসরি আসা অসম্ভব হয়ে গেছে, যা একটি খুবই ভাল লক্ষণ। যার কারণে প্রচলিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা মানুষকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে তা কিছুটা হলেও বোঝার সুযোগ আমাদের হয়েছে, যে সুযোগ বিশ্বের অনেক দেশেই হয় নি। মেক্সিকোতে কয়েকশত বছর ধরে গণতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র আর রাজতন্ত্র ঘুরে ঘুরে এসে এখনও পর্যন্ত সাধারণ জনগণের জন্য একটি সুষ্ঠু ও সুন্দর ব্যবস্থা উপহার দিতে পারে নি। দারিদ্র্য এখনও সেখানে প্রধান সমস্যা, পক্ষান্তরে ধনীদেব দৌরাত্ম প্রচুর, এমনকি কারও কারও প্রাইভেট আর্মি বা ব্যক্তিগত সেনাবাহিনীও রয়েছে। আমাদের দেশেও কি সেরকম লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করে নি?

৪। অবিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়া গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অবিশ্বাস আর দুর্নীতি ছড়ায়,

প্রয়োজন বিশ্বাস ও আস্থাভিত্তিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থাঃ

আমি মনে করি রাষ্ট্র ব্যবস্থার মূলনীতি সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ভিত্তিতে তৈরী হলে তা ধীরে ধীরে দেশের সবক্ষেত্রে সন্দেহ ও অবিশ্বাস ছড়ায়, এবং বাস্তবেও আমরা তাই দেখতে পাচ্ছি। বর্তমান যে দলভিত্তিক গণতান্ত্রিক পদ্ধতি আমরা অনুসরণ করছি তার মূলনীতি হচ্ছে যে মানুষ মাত্রই খারাপ, তাকে বিশ্বাস করা যাবে না। এর মূলনীতি বলছে যে ক্ষমতা মানুষকে দুর্নীতিবাজ করে তোলে, তাই সরকারী দলকে চেক এন্ড ব্যালান্স করবার জন্য, বা তার দুর্ভর্যকে সহনীয় পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য বিরোধী দল থাকতে হবে। অর্থাৎ এ ব্যবস্থার মূল দর্শনই হচ্ছে মানুষকে অবিশ্বাস। এ ছাড়া যারা শাসন ব্যবস্থায় থাকবে তাদের দুর্নীতি ও দুর্ভর্য থাকবেই ধরে নেয়া হচ্ছে, কেবল তাকে সহনীয় পর্যায়ে ধরে রাখা যায় কিনা তার চেষ্টাই করা হয়েছে।

বাস্তব অভিজ্ঞতায় তাকিয়ে কি দেখা যায়? বিরোধী দল থাকা সত্ত্বেও সরকারী দলের দুর্নীতিকে কি বাগে রাখা সম্ভব হচ্ছে? বরঞ্চ দেখা যাচ্ছে দুর্নীতির ব্যাপারে তারা দু দলই একত্র হয়ে ধন সম্পদে ফুলে উঠছে, দেশের বাকী জনগণের ধন সম্পদ কেড়ে নিয়ে। দ্বিতীয়তঃ, আমি মনে করি *দুর্নীতির সহনীয় পর্যায় বলে কিছু নেই।* তাহলে যে যার ইচ্ছা মত সহনীয় পর্যায় বিবেচনা করে নেবে। যারা ক্ষমতায় থাকবে তারা বিশাল বিশাল দুর্নীতি করেও হয়ত ভাববে যে তারা সহনীয় সীমার মধ্যে থাকছে, অথচ বাইরের যে কারও দৃষ্টিতে তা হয়ত সীমাহীন মনে হবে। আমাদের দেশের ইদানীংকার ঘটনাবলী তারই ইঙ্গিত দেয়। পত্র পত্রিকার ছবিতে দেখা যায় যে বিশাল বিশাল দুর্নীতির জন্য গ্রেফতার হলেও এ ধরনের মানুষেরা হাসছেন, জয়সূচক চিহ্ন দেখাচ্ছেন।

আর অবিশ্বাসের ব্যাপারটি একটি উদাহরণ দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করছি। ধরুন, আপনার সন্তানদের ছোটবেলা থেকে শিক্ষা দিচ্ছেন যে ভাইবোন কেউ যেন কাউকে বিশ্বাস না করে, নিজের সব জিনিস যেন তালা-চাবি দিয়ে রাখে। কল্পনা করুন তো কি রকম মানুষ তারা হবে? নিশ্চয়ই সুমানুষ নয়। রাজনীতিতেও কি দেখছি আমরা? পারস্পরিক অবিশ্বাস কি ভয়ানক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, যারা দেশের মধ্যে সবচেয়ে উচ্চশিক্ষিত, দলীয় রাজনীতিতে জড়িয়ে গিয়ে তারাও কি ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ করছেন।

জীবন থেকে নেয়া অভিজ্ঞতার আলোকে আমি বলতে চাই যে অবিশ্বাস বা অনাস্থার উপর ভিত্তি করে তৈরী করা রাষ্ট্র পদ্ধতি চালু করলে যে ব্যক্তি বিশ্বাস রাখতে চায়, ভাল থাকতে চায়, তার জন্য চলা কঠিন হবে। যে বিশ্বাস ভঙ্গ করবে, দুর্নীতি করবে তারই আপাতঃ জয়জয়কার চলবে চারদিকে। যার ফলে মানুষের অবিশ্বাসকেই এ ব্যবস্থা উজ্জীবিত করবে, এবং খারাপ মানুষের সংখ্যাই কেবল বাড়তে থাকবে। আমাদের দেশের অভিজ্ঞতা কি এ কথাকে সায় দেয় না?

এ প্রসঙ্গে আর একটি উদাহরণ দিচ্ছি। আমাদের দেশে ধরে নেয়া হয় যে সবাই কর ফাঁকি দিতে চায়। তাই যারা কর ফাঁকি দেবে তাদের জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রেখে কর কর্মচারীদের হাতে প্রচুর ক্ষমতা দিয়ে দেয়া হয়। উদ্দেশ্য, কর ফাঁকি দেয়া যেন কঠিন হয়। ফলে কি দাঁড়ায়? কর কর্মচারীদের সীমাহীন দুর্নীতির কথা না বলাই ভাল। যারা কর ফাঁকি দিতে চায় তারা এসব কর্মচারীর যোগসাজশে নামমাত্র কর দিয়ে ভালই চলছে। কিন্তু যে সৎ থেকে সঠিকভাবে কর দিতে চায় তার জন্য হয়রানী বেড়েছে অনেকগুণ। আবার নীতিমালা তৈরীর সময় ধরেই নেয়া হয় যে বেশীর ভাগ মানুষ কর ফাঁকি দেবে। তাই সরকারের হাতে যেন প্রয়োজনীয় পরিমাণ অর্থ আসে, সে জন্য করের হারও অবাস্তবভাবে বেশী রাখা হয়। ফলে সৎ উপার্জন থেকে নিয়মমাফিক কর দিলে বেঁচে থাকাটাই তার জন্য অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তার পরও সৎভাবে নিয়মমাফিক কর দিতে গেলে দুর্নীতিবাজ কর কর্মচারীদের হয়রানীও বেড়ে যায় বহুগুণে। কারণ তারা চায় না যে কেউ সৎভাবে কর দিক, তাহলে তাদের বাড়তি আয়ের পথ থাকে না। শেষ পর্যন্ত ইচ্ছা না থাকলেও সে সৎ ব্যক্তিও কর ফাঁকি দেয়ার মত দুর্নীতি করতে বাধ্য হয়। আপনি সারাজীবন সৎ থেকে নিজের উপার্জিত পেনশন নিতে গিয়ে যখন দেখবেন যে ঘুষ না দিয়ে আপনার সারা জীবনের সঞ্চয় হাতে পাচ্ছেন না, তখন কি আপনিও দুর্নীতি করতে বাধ্য হবেন না?

তাই অবিশ্বাসকে ভিত্তি করে রাষ্ট্র ও সরকার পদ্ধতি তৈরী করলে তা অবিশ্বাসই ছড়াবে যার সরাসরি পরিণতি হচ্ছে দুর্নীতি ও সন্ত্রাস।

৫। প্রচলিত গণতন্ত্রের দর্শন স্ববিরোধীতায় পূর্ণঃ

আমাদের প্রচলিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নিজের ঢাকঢোল নিজে পিটিয়ে নেতৃত্ব চাইতে হয়, যা নীতিবান মানুষের আদর্শ বিরোধী। ন্যায় ও যোগ্যতার বিচারের ব্যবস্থা না রেখে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটের রায়ের ব্যবস্থা করা হয়। যেহেতু এ ব্যবস্থাগুলো ঠিক নয়, তাই সেখানে ধ্বস নামে। তখন জোড়াতালি দিয়ে ন্যায় বিচার ও যোগ্যতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য কিছু ব্যক্তিকে খুঁজে তাদের সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠান তৈরী করে দেয়া হয় – যেমনটি আমাদের দেশে রয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন। কিন্তু এখানে আবার ধরে নেয়া হয় যে যাদেরকে এ পদগুলোতে নিয়োগ দেয়া হবে তাদের কখনোই পদত্যাগ হবে না। তাই তারা নিজেরা যদি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ না করেন তবে তাদেরকে সরানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। এমনভাবে নিয়োগ দেয়া হয় নির্বাচন কমিশনারদের, হাই কোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের। নিজে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ না করলে যাদেরকে সরানো বলতে গেলে অসম্ভব। আবার তাদের বিচারের সমালোচনা করার এখতিয়ারও আর কারও নেই, তাহলে আদালত অবমাননা হবে ধরে নেয়া হয়। হ্যাঁ, সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের ব্যবস্থা একটি আছে, কিন্তু বাস্তবে তার ব্যবহার খুবই কঠিন, দীর্ঘ সময়ের, এবং এটিও প্রায় অসম্ভবের পর্যায়ে। আদালত অবমাননার ধারার কারণে অপর কারও পক্ষে এ ব্যক্তিবর্গের ভুল কর্মকাণ্ডের কথা মুখ ফুটে বলাটাই তো অসম্ভব।

এর অর্থ হচ্ছে যে দু দিকেই ভুল জীবন দর্শন ব্যবহার করা হয়েছে, যা স্ব-বিরোধীতায় পূর্ণ। একদিকে বলা হচ্ছে কোন মানুষকে বিশ্বাস করা যাবে না, সবাই নীতিহীন। তাই সরকারী দলের বিপক্ষে দাঁড় করানো হচ্ছে বিরোধী দলকে। আবার কতিপয় মানুষকে অতি-মানুষ বা সুপার-হিউম্যান সেরকম কিছু একট ধরে নেয়া হচ্ছে, যাদেরকে ক্ষমতা থেকে সরানো প্রায় অসম্ভবের পর্যায়ে রাখা হয়েছে।

৬। রাষ্ট্র প্রতিনিধি, না রাষ্ট্র নেতা ?

আর একটি স্ব-বিরোধীতা হচ্ছে নির্বাচন ব্যবস্থা। প্রচলিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূল দর্শনে বলা হয় যে জনগণ সবাই সমান, তাদের সবারই দেশ চালানোর যোগ্যতা আছে। কিন্তু সবাই একসঙ্গে তো দেশ চালাতে পারে না, তাই কিছু ব্যক্তিবর্গকে প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচন করে দেয়া হোক। কিন্তু পরক্ষণেই এই নির্বাচিত ব্যক্তিদেরকে আবার বলা হচ্ছে রাষ্ট্রনেতা। নেতা আর প্রতিনিধি এক জিনিস নয়। একটি জনগোষ্ঠীকে নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নেতা প্রয়োজন। তার মানে সে জাতির এগিয়ে যাওয়ার এখনও বাকী,

অর্থাৎ তারা এখনও সবাই সমান হতে পারে নি। আর প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যপারটি আসে সেখানেই, যেখানে ইতিমধ্যে সবাই সমান হয়ে গেছে, বা চূড়ান্ত লক্ষ্যে শতকরা একশত ভাগ অর্জন করা হয়ে গেছে।

একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে যে, যে ভিত্তির উপর প্রতিনিধি নির্বাচন করার কথা বলা হচ্ছে তার দার্শনিক ভিত্তি সম্পূর্ণ বেঠিক। এখানে বলা হচ্ছে যে একটি দেশের প্রতিটি মানুষ সমান এবং সমান যোগ্যতাপূর্ণ। তার অর্থ দেশের সব মানুষের আয় সমান, শিক্ষাগত যোগ্যতা সমান, ক্ষমতা বা প্রভাব সমান। এটি কি বাস্তবে কোন দেশে আছে, বা সম্ভব? বস্তুতপক্ষে এটি হচ্ছে দেশের আদর্শ লক্ষ্য বা স্বপ্ন, যে লক্ষ্যকে সামনে রেখে দেশকে নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এ লক্ষ্যে শতকরা একশত ভাগ পৌঁছানো কোন দেশের পক্ষেই সম্ভব নয়, কিন্তু চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে সবসময়েই। আবার একটি পর্যায়ে পৌঁছার পর আরও উপরে ওঠার চেষ্টা চালু না রাখলে সে পর্যায়টি ধরে রাখাও সম্ভব নয়। এটি ব্যক্তি জীবনের মতই। নিজেকে উন্নত মানুষ হিসেবে তৈরী করার জন্য, এবং তা ধরে রাখার জন্য প্রতিনিয়তঃই চেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়, নিজের কু-প্রবৃত্তির সঙ্গে যুদ্ধ বা জিহাদ করতে হয়। যে যত এগিয়ে যেতে পারে সেই তত উন্নত। কিন্তু শতকরা একশত ভাগ উন্নত হওয়ার কোন মাপকাঠি সেখানে নেই। এ এক অসীমের উদ্দেশ্যে যাত্রা যেন। আবার চেষ্টা বন্ধ করলেই পতন আসবে স্বাভাবিকভাবে। পতনটি হচ্ছে সাধারণ নিয়ম।

একইভাবে যোগ্য ও সু-নেতৃত্বের মাধ্যমে দেশের মানুষকে সবাইকে সমান করার লক্ষ্যে চেষ্টা করে যেতে হবে, সবাইকে নিয়ে সুন্দর একটি সমাজ তৈরীর লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হবে, যে প্রচেষ্টার কোন শেষ নেই। কিন্তু তাই বলে হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকলে চলবে না, হাল ছেড়ে দিলেই উল্টো স্রোতের টানে পিছিয়ে পড়তেই হবে। আবার দেশের সবাইকে সম্পূর্ণভাবে সমান করার লক্ষ্য শতকরা একশতভাগে অর্জিত হয়ে গেছে, তা কখনোই দাবী করা সম্ভব নয়। কোন দেশই তা বাস্তবে দাবী করতে পারে না। তাই সবাই সমান হয়ে গেছে ধরে নেয়াটা যে কোন দেশের জন্য বা যে কোন সময়ের জন্যই সঠিক নয়, এবং এ তত্ত্বের ভিত্তিতে তৈরী করা যে কোন পদ্ধতি ব্যর্থ হতে বাধ্য। প্রচলিত গণতন্ত্রেও তাই হয়েছে। একই ভুল ধারণায় সেখানে ভাবা হয়েছে যে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি, নির্বাচন কমিশনার বা দুর্নীতি দমন কমিশনার – এরা মনুষ্যত্বের চূড়ান্ত শীর্ষে পৌঁছে গেছেন, সেখান থেকে তাদের পতন হবার কোন সম্ভাবনা নেই। সেটিও বাস্তবে সম্পূর্ণ ভুল ধারণা।

তাই দেখা যাচ্ছে জীবন দর্শনের সম্পূর্ণ ভুল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রচলিত গণতন্ত্র। তার ফলে যা হবার তা হয়েছে, এবং হচ্ছে। কেবল বাংলাদেশ নয়, গোটা পৃথিবীই কেমন যেন মানুষের বাসের অযোগ্য হয়ে পড়ছে।

৭। দল ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ করেঃ

পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীন। প্রতিটি মানুষেরই চিন্তা চেতনার মধ্যে কিছু পার্থক্য, অর্থাৎ স্বকীয়তা থাকবেই। এমনকি আপন ভাইবোনেরও চিন্তা চেতনায় বিশাল পার্থক্য থাকে। এ বিষয়টি আমাদের মজাগত, তাই ভিন্ন মতাবলম্বী কেউ হলেও তার ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় আমরা হস্তক্ষেপ করি না। যেহেতু মানসিক শক্তিতে সবাই স্বতন্ত্র, তাই প্রত্যেকেরই এ ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষায় আমরা মানসিক দিক দিয়ে স্বাভাবিকভাবেই তৈরী।

কিন্তু যখনই দুজন, তিনজন, ততধিক ব্যক্তি একত্র হয়ে কয়েকটি বিষয়ে একমত পোষণ করে দল গঠন করে, তারা একক ব্যক্তি থেকে শারীরিকভাবে অনেকগুণ শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান হয়ে যায়। তাদের মতামত দুর্বল হলেও সবাই যেন মানতে বাধ্য হয় সেজন্য তারা বল প্রয়োগ করতেও দ্বিধা করে না। এমতাবস্থায় আমি মনে করি আমার ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর আঘাত আসছে। তাই প্রচলিত গণতন্ত্র পদ্ধতিতে যারা দল গঠন করে তারা মানসিক দিক দিয়ে না হলেও পার্থিব শক্তিতে ক্ষমতাবান হয়ে যায়, যার দল যত বড়, সে তত ক্ষমতাবান। তাই দল তৈরী করার মাধ্যমে ব্যক্তি-মানুষের স্বাধীনতা কেড়ে নেয়া হয়।

বলা হতে পারে মানুষ দলবদ্ধ জীব। কিন্তু এ দল নিজেদের মধ্যে বিবাদ তৈরীর দল নয়। আগেকার দিনে একটি গোত্রের সবাই একই দলভুক্ত থাকত, গোত্রের সবাইকে রক্ষা করবার জন্য। নিজেদের মধ্যে বিবাদ করার জন্য একই গোত্রের মধ্যে আলাদা আলাদা দল কখনই ছিল না। আবার একটি গোত্রের মধ্যেও বিভিন্ন দল হতে পারে অন্যদেরকে সেবা দেয়ার জন্য, সেবা দেয়ার প্রতিযোগিতা তৈরী করার জন্য। কিন্তু যখন দল করার ফলে নিজেদের স্বার্থ অর্জনের সুযোগ চলে আসে তখন তখন দল হতে পারে ধ্বংসের গোড়া।।

৮। যদি প্রচলিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ভাল হয় তবে দেশের সব ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করি না কেন?

সমাজের জন্য যে কোন সফল পদ্ধতির একটি গুণ থাকতে হবে, তা হল, পদ্ধতিটি যদি সমাজের একটি ক্ষেত্রে সফল হয়, তবে আরও অনেক ক্ষেত্রেও সে পদ্ধতি সফল হবে। কারণ একই মানুষের চরিত্র এবং স্বভাব নিয়েই এদের কর্মকাণ্ড। প্রচলিত দলীয় নির্বাচনভিত্তিক গণতন্ত্র ব্যবস্থা যদি আদর্শ ও সফল হয়, তবে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও এ ব্যবস্থা সফল হবে।

চলুন কল্পনায় কোন একটা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান থেকেই শুরু করি। সেখানে একজন ব্যবস্থাপনা পরিচালক তার অধীনে কিছু ব্যক্তিকে নিয়ে প্রতিষ্ঠানটিকে পরিচালনা করে সফলতার দিকে নেয়ার চেষ্টা করেন। প্রতিষ্ঠানটিকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, লাভের মুখ দেখাতে হবে, প্রতিষ্ঠানে যারা কাজ করেন সবার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক প্রয়োজন মেটাতে হবে। প্রচলিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সেখানে চালু করতে চাইলে প্রথমেই ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ অন্যান্য নির্বাহী পদগুলো নির্বাচনের মাধ্যমে বেছে নিতে হবে। কমপক্ষে দু'তিনটি দল থাকবে সেখানে। নির্বাচনের মাধ্যমে একটি দল ক্ষমতায় গেলে অপর দলগুলো বিরোধী দল হিসেবে থাকবে। তারা প্রতিষ্ঠানের কোন প্রচলিত কাজ করবে না, কেবল ক্ষমতাসীন দলের প্রতিটি কাজের বিশ্লেষণ করে কথায় কথায় তাদের ভুল ধরিয়ে দিয়ে তাদেরকে সরে দাঁড়াতে বলবে, আবার নির্বাচন চাইবে। কখনও কখনও ধর্মঘট ডেকে কোম্পানীকে অচল করে দেবে, কোম্পানীর আয়ের ব্যবস্থাকে পুরো বন্ধ করে দেবে। কিন্তু কোম্পানীর খাত থেকে এদের সবাইকে মাসে মাসে নিয়মিত বেতন-ভাতা দেয়া হবে। অপরদিকে ক্ষমতাবান দল তাদের পরিকল্পনাগুলো যে ঠিক তা প্রমাণ করার জন্য সভা করবে, প্রচার করবে, বিরোধী দলের ডাকা ধর্মঘট ব্যর্থ করার জন্য সচেষ্ট হবে। তাদের বেশীরভাগ সময় এবং বুদ্ধি ব্যবহার করে তারা পরিকল্পনা করবে কিভাবে বিরোধী দলের মুখ বন্ধ করা যাবে, আগামী নির্বাচনে কিভাবে জেতা যাবে। তার জন্য প্রস্তুতি নেবে। আর এসব দিকে মনোযোগ দিতে গিয়ে প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার সুযোগ থাকবে খুবই কম, কোনমতে জোড়াতালি দিয়ে প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা চলবে। কোন পদক্ষেপ নিলেও আবার পদে পদে বিরোধী দলের যৌক্তিক-অযৌক্তিক সমালোচনা আসতে থাকবে, তাই সে পদক্ষেপ শেষ করা হবে খুবই দুঃসাধ্য। দেখতে দেখতে তাদের সময় পার হয়ে যাবে, তখন সবাইকে বলবে যে পরবর্তীতে আবার তাদের ভোট দিয় ক্ষমতায় এনে দিলে পরিকল্পনা অনুযায়ী পদক্ষেপ নেবে। পরবর্তীতে যেই ক্ষমতায় আসুক না কেন, একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি হতে থাকবে। এবার ভাবুন, এ কোম্পানীটি কদিন চালু থাকতে পারবে?

এবার উদাহরণটি নিন একটি সমুদ্রগামী জাহাজের। জাহাজে বিভিন্ন যোগ্যতার বিভিন্ন লোক রয়েছে, কিন্তু খালাসীর সংখ্যাই সেখানে বেশী। নির্বাচন দিলে সেখানে খুব সম্ভবতঃ একজন বা কয়েকজন খালাসীই জাহাজের নেতৃত্ব পাবেন, কারণ তাদের দলই হবে সেখানে মেজরিটি। এখন মনে করুন সমুদ্রে ঝড় উঠেছে, জাহাজের সুশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ ক্যাপ্টেন, ইঞ্জিনিয়ারদেরকে সরিয়ে খালাসীদের পরিচালনায় জাহাজটি কি তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারবে, না তার অনেক আগেই ডুবে যাবে? আর জাহাজের সীমিত ও দুর্লভ খাবার দাবাড় বসে বসে বিরোধী দল সাবাড় করবে, ক্ষমতাসীন দলকে সমালোচনা করা ছাড়া যাদের আর কোন কাজ নেই। তবে চিন্তা করুন, এ উদাহরণগুলোর মত ছোট সমাজে যদি প্রচলিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চলতে না পারে, তবে কোটি কোটি মানুষের সমন্বয়ে তৈরী একটি বড় সমাজকে এ ব্যবস্থা কি ভাবে এগিয়ে নেবে? পিছিয়ে যাওয়াই তো এর সাধারণ ধর্ম।

৯। অভিজ্ঞতা থেকে শেখার ব্যবস্থা প্রচলিত গণতন্ত্রে নেইঃ

মানুষ মাত্রই তার জ্ঞান ও ক্ষমতায় সীমিত, তাই প্রাথমিক পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে কোন কাজ শুরু করার পর এর ফলাফল থেকে শিক্ষা নিয়ে পদ্ধতিকে পরিবর্তন ও পরিমার্জন করে এগোতে থাকে সে, যাকে বলা হয় অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ। প্রচলিত গণতন্ত্রে কিন্তু মানব সভ্যতার এ মৌলিক পদ্ধতিটির প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না। প্রতিটি দলকে নির্বাচনের আগে নিজস্ব ম্যানিফেস্টো দিতে হয়। নির্বাচনে যে দল জিতেছে তাদের ম্যানিফেস্টো বেশীর ভাগ জনগণ গ্রহণ করেছে বলে ধরে নেয়া হয়, এবং বিজয়ী দল সে ম্যানিফেস্টো অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করবে। পরবর্তীতে অভিজ্ঞতার আলোকে যদি বোঝা যায় যে ম্যানিফেস্টোর বাইরে যেতে হবে, তার পরেও সরকারী দল সে সাহস করবে না, কারণ করতে গেলেই বিরোধী দল তাকে আটকাবে। তাই বুঝেও সে তার ভুল পদ্ধতিই চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে, তার পক্ষে সাফাই গাইবে। ধরুন, সরকার পরিচালনার কিছুদিন পর ক্ষমতাসীন দল বুঝতে পারল যে কোন একটি বিষয়ে তাদের পরিকল্পনাটি ভুল, বিরোধী দলের ম্যানিফেস্টোর পরিকল্পনাটিই সঠিক। চিন্তা করুন তো ক্ষমতাসীন দলের পক্ষে এ উপলব্ধিটি কাজে লাগানো দূরে থাকুক, প্রকাশ করাই সম্ভব হবে কিনা। কারণ অনুভূতিটি প্রকাশ করা মাত্রই বিরোধী দল ক্ষমতাসীন দলকে ক্ষমতা ছেড়ে দেয়ার জন্য ত্যক্ত করতে থাকবে, আন্দোলন গড়ে তুলবে। তাদের ম্যানিফেস্টো নিয়ে তারাই সরকার গঠন করতে চাইবে। তাই অভিজ্ঞতা থেকে শেখার যে ব্যাপারটি মানব সভ্যতার মূল চাবিকাঠি, তা কখনই সুযোগ পাবে না গণতন্ত্রের এ পদ্ধতিতে। বরঞ্চ জেনেশুনে ভুল পদ্ধতিই জোর করে চালাবা চেষ্টা দেখা যাবে সেখানে, যার ফলাফল দেশের সবকিছুকে নিম্নমুখী করে দেবে।

১০। দলীয় নির্বাচনভিত্তিক গণতন্ত্র রাজতন্ত্রকে রক্ষা করে, আর যেখানে রাজতন্ত্র নেই সেখানে ‘নব্যরাজা’ তৈরী করেঃ

পৃথিবীর পিছনের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে বর্তমানে প্রচলিত দলীয় নির্বাচনভিত্তিক গণতন্ত্র চালু হয়েছে কয়েক শত বছর আগে বৃটেনে ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে (উল্লেখ্য প্রাচীন গ্রীসের গণতন্ত্র এরকম ছিল না, তা ছাড়া শেষ পর্যন্ত তাদের গণতন্ত্রটিও সফল হতে পারে নি)। ইউরোপে সে সময়ে রাজতন্ত্র উচ্ছেদের জন্য এক প্রবল আন্দোলন শুরু হচ্ছিল। এটি বোধহয় অনুমান করা অযৌক্তিক হবে না যে রাজতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখার জন্য বুদ্ধি উদ্ভাবন করার প্রয়োজন ছিল, আর সেটির জন্য বহুল প্রচলিত ‘ডিভাইড এন্ড রুল’ কৌশলটিই তখন বেছে নেয়া হয়। জনগণকে যদি দলে দলে ভাগ করে ফেলা যায় তবে তাদের মধ্যে ঝগড়া-মারামারি লাগা স্বাভাবিক, আর মাত্রা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার আগেই রাজা বা রাণী বলবেন, “থাম”। ঝগড়া থেমে যাবে, কারণ জনের থেকেই সে দেশের মানুষের মনের গভীরে রাজার প্রতি একটি সমীহ তৈরী হয়ে আছে যা তাদেরকে সে দুঃসময়ে থামতে বাধ্য করবে। তাতে জনগণের মনে হবে, “সত্যিই তো, রাজতন্ত্র না থাকলে আমরা শেষ হয়েই গিয়েছিলাম”। রাজতন্ত্রও তাই জনগণের ইচ্ছাতেই টিকে থাকবে। রাজা ও তার পরিবারের লোকজন আগের মত দাপটে না হোক, কমপক্ষে বিলাসিতায়, আরাম আয়েসে বংশপরম্পরায় জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারবেন। বৃটেনে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে অনেক কথাবার্তা হয়, পত্রিকায় লিখালিখি হয়, কিন্তু গণভোটে তুললে দেখা যাবে যে সে দেশের বেশীরভাগ মানুষই রাজতন্ত্রের পক্ষে। কারণ তাদের মনের গভীরে তারা বুঝতে পারে যে রাজা না থাকলে সংসদের দলগুলোর মধ্যে ঝগড়া সীমার বাইরে চলে যাবে, তাতে দেশে স্বস্তিতে থাকা যাবে না। তাই সেখানে এ কথাটি প্রচলিত, “Monarchy is the last thread of unity” বা “রাজতন্ত্র হচ্ছে দেশের মানুষকে একত্রে বেঁধে রাখার শেষ সূতো”। এই কিছুদিন আগেও অস্ট্রেলিয়ার মানুষকে সুযোগ দেয়া হয়েছিল ভোটের মাধ্যমে – তারা কি স্বাধীন হতে চায়, না ১৪ হাজার মাইল দূরের বৃটেনের রাজতন্ত্রের অধীনে থাকতে চায়, যেমনটি এখন আছে। স্বাধীনতা যেখানে প্রতিটি মানুষেরই মনের ভিতরের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা, যেখানে আমরা লক্ষ লক্ষ

মানুষের রক্ত দিয়ে স্বাধীন হয়েছি, সেখানে অস্ট্রেলিয়ার মানুষ ভোট দিয়ে নিজ ইচ্ছায় পরাধীন থেকে গেল। অর্ধেক পৃথিবী দূরেও রাজতন্ত্র টিকে থাকল।

আর আগে আলোচনা করা হয়েছে যে নির্বাচন ভিত্তিক পদ্ধতিতে সত্যিকার নীতিবান ও যোগ্য ব্যক্তি কখনোই ক্ষমতায় আসব না। অযোগ্য মানুষের নেতৃত্বে দেশের অবস্থা যখনখারাপ হবে তখন মানুষের মনে এ ধারণাটি থাকবে যে রাজতন্ত্রই ভাল ছিল। রাজতন্ত্র পুরোপুরি ফিরে না এলেও মানুষের মনে তাদের প্রতি মোহটিকে ধরে রাখা যাবে, রাজপরিবারের সদস্যদের জন্য যা হবে আশীর্বাদস্বরূপ।

আমার আর একটি পর্যবেক্ষণ হচ্ছে যে যেখানে রাজতন্ত্র নেই, সেখানে প্রচলিত দল ও নির্বাচন ভিত্তিক গণতন্ত্র ‘রাজা’ তৈরী করে। দেখা যাবে যে ধীরে ধীরে রাজার হালে চলাচলকারী ধনী এলিট শ্রেণী বা পারিবারিক ডাইনাস্টি তৈরী হচ্ছে যারা দেশের গোটা শাসন ব্যবস্থাকে নিজেদের স্বার্থে নিয়ে যাবে। সাধারণ জনগণকে আরও দারিদ্র ও ক্ষমতাহীন অবস্থায় ঠেলে দেবে। আমাদের দেশেই আমরা দেখতে পারি, দেশের রাজনীতিকরা কি ভাবে গুণ্য থেকে কয়েক বছরের মধ্যেই কোটি কোটি টাকার সম্পদের মালিক হয়ে যাচ্ছেন, অর্থাৎ এলিট শ্রেণীতে পদার্পণ করছেন, বা ‘রাজা’ হয়ে যাচ্ছেন। খোঁজ নিলে দেখা যাবে যে দেশের প্রায় প্রতিটি ধনী ব্যক্তি নিজে, বা তার পূর্ব প্রজন্মে কেউ না কেউ রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। মেক্সিকোর কথা শুনেছি। সেখানে কয়েকশত বছর ধরে গণতন্ত্র চলছে। মেক্সিকোর জনগণের সম্পদের অসম বন্টন সম্পর্কে মনে করিয়ে দেবার হয়ত প্রয়োজন হবে না। শুনেছি সেখানে এত ধনী ব্যক্তির আছেন যে নিজেদের সম্পদ দেশের গরীবদের থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য রীতিমত প্রাইভেট আর্মি বা ব্যক্তিগত সেনাবাহিনী রাখছেন। আমাদের দেশেও সেরকম লক্ষণ কি দেখা যেতে শুরু করে নি? আবার রাজনীতিতে ডাইনাস্টি বা পারিবারিক নিয়ন্ত্রণ কেবল আমাদের দেশেই নয়, পাশের দেশ ভারত, যাকে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক দেশ বলা হয় সেখানেও কি লক্ষণীয় নয়?

গণতন্ত্রে রাজা বা এলিট শ্রেণীর আর একটি রূপ হচ্ছে ধনী ব্যবসায়ী গোষ্ঠী। তারা সরাসরি রাজনীতিতে না এসেও দেশের সমস্ত নীতিমালাকে নিজেদের সুবিধামত নিয়ন্ত্রণ করে নেয়। ইউরোপ ও আমেরিকার যেসব দেশে রাজা-রানী নেই সে সব দেশে কিন্তু ধনী ব্যবসায়ীরাই ক্ষমতার চাবিকাঠি নাড়ছেন। বাংলাদেশেও আমরা দেখেছি, দু বিবাদমান রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে যদি একটু হলেও কাছাকাছি কেউ আনতে পেরে থাকে তারা হচ্ছে দেশের ধনী ব্যবসায়ীরা। বিবাদমান রাজনৈতিক দলের কারণে তাদের ব্যবসায়ে বিশাল ক্ষতি হলে স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক দলগুলোর উপরে কর্তৃত্ব স্থাপন হবে তাদের স্বাভাবিক পরবর্তী পদক্ষেপ। কিন্তু এর ফলাফল দেশের সাধারণ দরিদ্র জনগণের পক্ষে কখনোই যাবে না।

পৃথিবীর সব দেশে নিশ্চয়ই অনেক জ্ঞানী, গুণী ও যোগ্য ব্যক্তি আছেন যাদের নেতৃত্বে তাদের নিজের দেশটিও ভাল চলত, গোটা পৃথিবীরও ভাল হত। কিন্তু দলীয় নির্বাচন ভিত্তিক গণতন্ত্রে এসব মানুষেরা কখনোই নেতৃত্বে আসবেন না। আগেও বলেছি, ভিতরের একটি ন্যায়বিচারের অনুভূতি তাদেরকে বলে যে, “এ ব্যবস্থায় ভুল আছে, এর মধ্যে ঢুকবে না”। প্রকৃতপক্ষে দলীয় নির্বাচন ভিত্তিক গণতন্ত্রের কারণেই অযোগ্য ব্যক্তির হাতে সব দেশের নেতৃত্ব চলে যাচ্ছে, যার ফলে সব মিলিয়ে গোটা পৃথিবীই মানুষের জন্য অনাবাসযোগ্য হয়ে উঠছে যেন।

১১। সন্ত্রাসী ও গডফাদার নির্মূল করে দিলেও আবার তৈরী হবেঃ

আমাদের একটি প্রচলিত ধারণা যে সন্ত্রাসী ও গডফাদার নির্মূল করে দিলেই দেশ সুন্দর হয়ে যাবে, প্রচলিত গণতন্ত্র সফল হবে। ধরে নেয়া যাক যে তাই কোনভাবে করা হয়েছে। দেশে আর কোন গডফাদার বা সন্ত্রাসী নেই। নির্বাচন শুরু হল। আমি আর আপনি দাঁড়িয়েছি নির্বাচনে। আমি বলছি আমি আপনার থেকে ভাল, আপনার থেকে যোগ্য, আমাকে যেন সবাই ভোট দেয়। আপনিও তো একই সুরে কথা বলবেন, তাই না? তখন আমি বলব যে আমাকে ভোট দিলে এলাকা স্কুল-কলেজ-হাসপাতাল করে দেব, রাস্তাঘাট ঠিক করে দেব। আপনি কি চুপ করে বসে থাকবেন? আপনি আরও বেশী বেশী করে নির্বাচনী ওয়াদা করবেন।

নির্বাচনে তো হেরে যাওয়ার জন্য নামি নি। এক পর্যায়ে আমি ভোটারদেরকে ব্যক্তিগতভাবে প্রভাবিত করার চেষ্টা করব, টাকা ঘুষ দিয়ে তাদের ভোট নেয়ার চেষ্টা করব। আমি যা দেব, আপনি তখন তার দ্বিগুণের কথা বলে একই পথে আসবেন। তখন ভয় দেখানে ছাড়া আমার গত্যন্তর থাকবে না। সন্ত্রাসীদের দলে নিয়ে ভোটারদের ভয় দেখাব। আপনিও কম যাবেন কেন? আপনি আরও বড় সন্ত্রাসীদেরকে দলে নিয়ে নির্বাচনী প্রচার চালাবেন। কথায় কাজ নাও হতে পারে ভেবে দু চারজন মানুষ খুন করেই আমাকে দেখাতে হবে যে আমি কি বলতে চাচ্ছি। তখন আপনাকে হয়ত তার বেশীই করে দেখাতে হবে।

প্রতি গ্রামে গ্রামে আমার আর আপনার এ ধরনের অনেক সন্ত্রাসী পুষতে হবে। তাদের খরচ আসবে কোথেকে? তখন বলে দেব যে তোমরা করে খাও, অর্থাৎ চাঁদাবাজী কর, টেন্ডার দখল কর, ভয় দেখাও। যদি কখনও তাদেরকে পুলিশ ধরে ফেলে, আমি ক্ষমতায় থাকলে ফোন করে জানিয়ে দেব, “ওরা আমার লোক, ওদেরকে যেন কিছু না করা হয়”। তখন পুলিশ সদস্যও ভাববে উপর থেকেই দুর্নীতি করা হচ্ছে, আমরা একটু করব না কেন?

বুঝতে পারলেন কি হল? আমি আপনিই হয়ে গেলাম গড-ফাদার, আর সন্ত্রাসীদের আবার জায়গা হয়ে গেল। তাই গড-ফাদার আর সন্ত্রাসী সৃষ্টি হওয়া সময়ের ব্যাপার মাত্র। প্রচলিত গণতন্ত্র ও দলীয় নির্বাচন ভিত্তিক ব্যবস্থা যতদিন চলবে, ততদিন আমরা গড-ফাদার আর সন্ত্রাসী থেকে মুক্ত হতে পারছি না, কারণ এর বীজ তো রয়ে গেছে প্রচলিত গণতন্ত্র ও দলীয় নির্বাচন ভিত্তিক ব্যবস্থার মধ্যে।

১২। প্রচলিত গণতন্ত্রে ঔপনিবেশিকতার সব ব্যবস্থা অটুট রয়েছেঃ

প্রচলিত গণতন্ত্রের ব্যবস্থাগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে ঔপনিবেশিক আমলের প্রশাসন ব্যবস্থাকে হুবহু রেখে দেয়া হয়েছে, বরঞ্চ কোথাও কোথাও আরও বেশী ঔপনিবেশিক হয়েছে আমাদের দেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থা। সেই একই ‘টপ-ডাউন’ বা ‘উপর থেকে নীচে’ ক্ষমতার ব্যবস্থা চালু রয়েছে। কেবল রাজা-রানীর স্থানে প্রধানমন্ত্রী বা কোথাও কোথাও প্রেসিডেন্টকে বসানো হয়েছে। তাই যারাই এ ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেন্ট এর যত কাছে, তার ক্ষমতাও তত বেশী, আর সে নিজেকে রাজার মতই ভাবে। জনগণ তার কাছে তুচ্ছ প্রজা। স্বাভাবিকভাবেই সব নীতিমালা এমনভাবে তৈরী হয়ে যায় যেন সম্পদ ও ক্ষমতা ধীরে ধীরে প্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেন্ট এর কাছের মানুষগুলোর কাছে কুক্ষিগত হয়ে যায়। এভাবে একটি নতুন ‘এলিট শ্রেণী’ বা ‘রাজার শ্রেণী’ তৈরী হয়ে যায়, যার কথা আগেও বলেছি।

প্রচলিত গণতন্ত্রে ভোট পদ্ধতির মাধ্যমে দেশের জনগণের বিশাল সম্পদ ও বিরাট রাজনৈতিক ক্ষমতা সব একত্র করে তুলে দেয়া হয় কিছু মানুষের হাতে, যাদেরকে আমরা সাংসদ বলে থাকি। তাদের মধ্যেও আবার শেষেষ গুটি কয়েক ব্যক্তির হাতেই সব ক্ষমতা কুক্ষিগত হয়ে যায়। এত বিশাল সম্পদ ও ক্ষমতা হতে পেয়ে তাদের মাথা ঠিক না থাকারই কথা। এ বিশাল সম্পদ ও ক্ষমতা ব্যবহারে তারা অভ্যস্তও নন, ফলে নিজেদেরকে নব্য রাজা হিসেবেই তারা ভাবতে শুরু করেন। তাছাড়া নিজেদেরকে নব্য রাজা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, আর ভবিষ্যতে রাজনৈতিক ক্ষমতা চলে গেলেও যেন একই ভাবে চলাফেরা করতে পারেন তার জন্য যা যা করণীয় তাই অগ্রাধিকার পায় এ গণতন্ত্রে। আর জনগণ যারা এ সম্পদের সত্যিকারের মালিক, তাদেরকে এবার শিক্ষা চাইতে হয় নিজেদের সম্পদই ফিরে পাবার জন্য, কখনও কখনও এর জন্য পুলিশের লাঠিপেটা সহ্য করতে হয়, গুলি খেয়েও মরতে হয়।

তাই এ পদ্ধতিতে ঘুরেফিরে জনসাধারণ হয়ে যায় আবার সেই আগের মত প্রজা, যার স্থান থাকে সবচেয়ে নীচে, সম্পূর্ণ রাজতন্ত্রেরই মত। একজন পুলিশ কনস্টেবল এর সামনে, একজন কর কর্মচারীর সামনে, বা একটি মোবাইল কোর্টের সামনে একজন সাধারণ নাগরিক নিতান্ত অসহায়। পুলিশের লোক যদি এসে দোকান-বাড়ী ঘরদোর ভাঙচুর করে যায়, সাধারণ নাগরিক কারোরই কিছু বলার নেই, কারণ পুলিশের সদস্য বা মোবাইল কোর্টের ক্ষমতা তো এসেছে উপর থেকে, বা নব্য রাজাদের তরফ থেকে। স্বাভাবিকভাবেই নব্য রাজাদের স্বার্থই দেখে পুলিশ বা অন্যান্য কর্মচারীরা, জনগণের স্বার্থ তারা দেখে না। এককালের

‘কোতোয়াল’, বা বৃটিশ সময়ের ‘লাল-পাগড়ী’ দেশের সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় নি। বরঞ্চ সাধারণ মানুষের মধ্যে ভীতি সৃষ্টি করে রাজার স্বার্থ দেখার জন্যই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছিল, যেমনটি আজও করা হচ্ছে।

আবার দেখুন, গণতন্ত্রে বলা হয় যে জনগণের অবস্থান হচ্ছে সবার উপরে। সেখানে একজন সিভিল সার্ভেন্ট (কিছুটা সুন্দর করে অনুবাদ করলে, ‘জনসেবক’) নিয়োগ পান জনগণকে সেবা দেয়ার জন্য। তাই তার কাজের মূল্যায়ণ করার কথা তার সেবাগ্রহণকারীদের, অর্থাৎ যে সব নাগরিকদের তিনি সেবা প্রদান করেছেন, তাদের। অথচ দেখুন, বর্তমান ব্যবস্থায় যে কোন নির্বাহী কর্মচারীর মূল্যায়ণ করেন তার উপরস্থ আর এক জন কর্মচারী, আবার তারটি করেন তার উপরের জন, যার সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে প্রধান মন্ত্রী বা প্রেসিডেন্ট, ব্যবস্থা ভেদে। তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রতিটি কর্মচারী চেষ্টা করে তার উপরের কর্মচারীকে খুশী রাখার জন্য, অর্থাৎ মূলতঃ প্রধান মন্ত্রী বা প্রেসিডেন্টকে খুশী রাখার জন্য, জনগণকে খুশী রাখার জন্য নয়। তাই যে কথা প্রথমে বলেছিলাম সেটি আবার বলা দরকার যে প্রচলিত গণতন্ত্রে কেবলমাত্র উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতা পাওয়া রাজাকে সরিয়ে ভোটের মাধ্যমে একজন প্রধান মন্ত্রী বা প্রেসিডেন্টকে সে জায়গাটিতে বসানো হয়েছে, কিন্তু মানসিকতা সহ সব ব্যবস্থাই রয়ে গেছে রাজতন্ত্রের।

আরও মজার ব্যাপার হচ্ছে যে বৃটিশরা চলে যাওয়ার পর আমাদের দেশে আমরা ঔপনিবেশিক সময় থেকেও বেশী ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছি। প্রথমেই দেখুন, ইংরেজীতে ‘পলিটিস্ম’ শব্দটি এসেছে ‘পলিটি’ বা ‘সুন্দর ভদ্র সমাজ’ শব্দটি থেকে, কিন্তু আমরা তার অনুবাদ করেছি ‘রাজনীতি’ বা রাজার নীতি হিসেবে। কেউ কেউ জোর করে বলতে চান যে ‘রাজনীতির’ অর্থ ‘নীতির রাজা’। কিন্তু বাংলা ব্যাকরণের সন্ধির হিসেবে ‘নীতির রাজা’ হবে ‘নীতিরাজ’, রাজনীতি নয়। আবার দেখুন, ‘অ্যাডমিনিস্ট্রেটর’ বলে যে শব্দটি চালু আছে তার অর্থ হচ্ছে বাস্তবায়নকারী, অর্থাৎ যিনি সরকারী নীতিমালার বাস্তবায়ন করেন। আমরা এর অনুবাদ করেছি প্রশাসক, অর্থাৎ যিনি শাসন করেন – রাজার শাসনের কথা মাথায় রেখে। ইংরেজীতে অ্যাডমিনিস্ট্রেটরদেরকে বলা হয় সিভিল সার্ভেন্ট, যার বাংলা অনুবাদ উপরে দিয়েছি। কিন্তু আমরা তাদেরকে নাম দিয়েছি ‘কর্মকর্তা’, ইংরেজীতে যার অনুবাদ করলে দাঁড়ায় ‘ওয়ার্ক-মাস্টার’। এ ধরনের কোন শব্দই কিন্তু সেখানকার সরকার ব্যবস্থায় নেই, আমাদের দেশে ঔপনিবেশিক সময়েও ছিল না। আসলে রাজার শাসন থেকে আমাদের মানসিকতা তো বেরিয়ে আসতেই পারে নি, উপরন্তু আমাদের মধ্যে যারা নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতাবান হয়েছেন, নিজের স্বার্থের লোভে তারা আরও বেশী ঔপনিবেশিক হয়ে গেছেন। পারিবারিক ডাইন্যাষ্টি চালু হয়ে গেছে বিভিন্ন দেশে। আবার কোথাও কোথাও ধনী ব্যবসায়ীদের হাতে সব ক্ষমতা চলে গেছে। আসলে গণতন্ত্রের চরিত্রই হচ্ছে এলিট শ্রেণী তৈরী করা, এবং আমাদের দেশেও তাই ঘটছে।

১৩। গণতন্ত্র ধর্ম নিরপেক্ষ, কিন্তু আদর্শ নিরপেক্ষ কেন নয়?

একটি দেশের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মচিন্তার মানুষ রয়েছে। তাই সবাইকে নিয়ে রাষ্ট্র গঠনে ধর্ম চলে এলে অসুবিধা হয় বিধায় গণতন্ত্রে ধর্ম-নিরপেক্ষতার উপর জোর দেয়া হয়েছে। কিন্তু দেশের মানুষকে আলাদা আলাদা দলে ভাগ করে রাখার জন্য জিইয়ে রাখা হয়েছে লেফটিস্ট বা রাইটিস্ট ধারণা, বা কোন বা কোন আদর্শ বা দর্শনকে। এ আদর্শ বা দর্শন কি ধর্মের মত ব্যাপার হয়ে গেল না? যে দর্শনের ধ্রুজাধারীরা মেজরিটি পেয়ে গেল, তারা অপর পক্ষের দর্শন বা আদর্শের উপর জোর করার সুযোগ পেয়ে গেল না কি ? তাই সত্যিকারের গণতন্ত্রে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বললেও আদর্শ নিয়ে দল গঠন করাটি মূলতঃ স্ববিরোধীতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

১৪। প্রচলিত গণতন্ত্রই আমাদেরকে পিছনে টেনে রেখেছেঃ

প্রচলিত গণতন্ত্রের বিপক্ষে এমনি আরও অনেক যুক্তি উত্থাপন করা যাবে এবং প্রচলিত গণতন্ত্রই আসলে আমাদেরকে পিছনে টেনে রেখেছে। আমার সীমিত চিন্তাশক্তি ও জীবন বোধের আলোকে দেশের বর্তমান

দূরবস্থার জন্য আমি দলভিত্তিক ও ভোটনির্ভর গণতন্ত্রকেই দোষী সাব্যস্ত করছি, কারণ এর মধ্যে মানুষে মানুষে অবিশ্বাস, ও পশুত্বকে উসকিয়ে দেয়ার যথেষ্ট উপাদান রয়েছে। অর্থনীতির ভুলও রয়েছে, কিন্তু রাষ্ট্র ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের ব্যাপারটি আগে ঠিক হওয়া দরকার। যোগ্য ও ঐকান্তিক নেতৃত্ব এলে বাকী বিষয়গুলো ধীরে ধীরে ঠিক হয়ে যাবে।

১৫। ভোট ব্যবস্থা একটি খোঁকা, মানুষকে বিভ্রান্ত করে রাখার কৌশল

গণতন্ত্রের কথা বলে মানুষকে প্রথমে বলা হয়, “আপনারা সবাই এ দেশের রাজা, তাই আপনারা সবাই মিলে দেশ শাসন করবেন। দেশের শাসন আপনার জনগণের অধিকার।” তার পর বলা হয়, “দেশের সবাই মিলে তো আর শাসনকাজ পরিচালনা করা যায় না, তাই আপনারা ভোট দিয়ে প্রতিনিধি নির্বাচন করুন, তারা আপনাদের হয়ে দেশ শাসন করবেন। এ ভোট দেয়ার অধিকারই হচ্ছে আপনার জনগণের অধিকার।” দেখুন কি সুকৌশলে জনগণকে প্রতারণা করা হচ্ছে। আর ভোটের মাধ্যমে জনগণের সমস্ত অধিকার ও ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে অল্পকিছু মানুষের হাতে কুক্ষিগত করে তাকেই আইন বলা হচ্ছে। এরপর এ সকল তথাকথিত গণপ্রতিনিধি জনমানুষের স্বার্থ বিরোধী কাজ করলেও বলার কিছু নেই। কারণ তারা বলবে যে জনগণ তাদের সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষার ম্যান্ডেট তাদের গুটিকয়েক প্রতিনিধির হাতে ন্যস্ত করে দিয়েছেন। অতএব তারা যা করবেন, তাই জনগণের ইচ্ছা ও আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। এমনকি জনগণকে সরকারের তরফ থেকে গুলি করে নির্বিচারে মেরে ফেললেও বলা হবে যে এটি জনগণেরই ইচ্ছা। আর এ ভোটের অধিকারটিকে ঢাকঢোল পিটিয়ে এমনভাবে প্রচার করা হচ্ছে যে মানুষের জীবনে এটিই যেন একমাত্র আরাধ্য বস্তু, ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারলেই যেন জীবনের সব অধিকার ও আনন্দ করার সুযোগ হয়ে যাবে।

অপরপক্ষে সামাজিক নিয়মের মূলনীতি বিশ্বাসের ভিত্তিতে তৈরী হলে তা মানুষের মধ্যে বিশ্বাস ও ভাল গুণগুলো ছড়াবে। চিন্তা করুন তো, আপনি যে প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট আছেন সেখানে একে অপরকে বিশ্বাস কি করছেন না? পারস্পরিক বিশ্বাস না থাকলে আপনার প্রতিষ্ঠান কি চলত? হ্যাঁ, এরকম পরিবেশেও সামান্য কিছু লোক অবিশ্বাসের কাজ করবে, কিন্তু ন্যায়পরায়ণ নেতৃত্ব ও ন্যায়ের পরিবেশ থাকলে এ ধরনের মানুষের সংখ্যা হবে খুবই নগণ্য। তাদেরকে প্রথমতঃ উপদেশ দিয়ে, তাতেও কাজ না হলে সাবধান করে, আর তাতেও কাজ না হলে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করে পরিবেশকে বিশ্বাসের উপর ধরে রাখা যায়, এবং তা করতেই হবে। বিশ্বাসের ভিত্তিতে পরিবার থেকে সমাজ সব চলছে। সব ক্ষেত্রেই এর সুযোগ কেউ কেউ নিতে পারে, কিন্তু তারপরও আমরা পারস্পরিক বিশ্বাস চালিয়ে যেতে চাই, কারণ এর অন্যথা হলে যে জীবন ব্যবস্থা গড়ে উঠবে তা কারও কাম্য নয়।

আর একটি উদাহরণ দিচ্ছি। পৃথিবীতে বহু স্বামী তার স্ত্রীকে অত্যাচার করেছে, হত্যাও করেছে, এবং এখনও করে যাচ্ছে। এর প্রেক্ষিতে আমরা কি এমন কোন নিয়ম করেছি যে সব স্বামী-স্ত্রীদেরকে আলাদা বাসায় আলাদা ভাবে জীবন যাপন করতে হবে? করি নি, কারণ তার ফলে যে জীবনটিকে কল্পনা করতে হচ্ছে সে জীবনের জন্য বেঁচে থাকার অর্থ হয় না। সারা জীবন আদরে বড় করা আমার নিজের কন্যা সন্তানটির নিরাপত্তার ভার একজন পুরুষের হাতে তুলে দিচ্ছি যার ভবিষ্যৎ আচরণ সম্পর্কে কেউ কোন গ্যারান্টি দিতে পারে না। অর্থাৎ, জেনে শুনেই আমরা এমন ঝুঁকি নিচ্ছি। তাহলে রাষ্ট্র ব্যবস্থা কেন বিশ্বাসের ঝুঁকির উপর চলতে পারে না?

অনেক মানুষকে নিয়ে গড়া যে রাষ্ট্র, সেখানেও মানুষের উপর বিশ্বাস বা আস্থার ভিত্তিতে ব্যবস্থা তৈরী করা জরুরী। যে বিশ্বাস রাখতে চায় তার জন্য তখন চলা সহজ হবে, এবং সে পুরস্কৃত হবে। ফলে সমাজে বিশ্বাস ও ভাল গুণ ছড়াবে।

তাই সুস্থ সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রণয়ন করতে হলে সমাজের চূড়ান্ত লক্ষ্যের দর্শনকে, অর্থাৎ, বিশ্বাসকে (Trust) সামনে রেখেই করতে হবে। যারা সে ব্যবস্থায় সহায়ক হবে তাদের সামাজিকভাবে উপরে তুলে ধরার ও পুরস্কৃত করার ব্যবস্থাও থাকতে হবে। পক্ষান্তরে যারা সে লক্ষ্যের বিপরীতে কাজ করবে তাদের জন্য থাকতে হবে প্রথমে উপদেশ, পরে সাবধানবানী ও সর্বশেষে কঠিন শাস্তি (Counselling, warning and punishment)। বাস্তবে এরকম ন্যায়ের পরিবেশ থাকলে বেশীরভাগ মানুষই ন্যায়ের পথে চলার চেষ্টা করবে। শতকরা মাত্র কয়েকজনকেই পাওয়া যাবে যাদেরকে শাস্তি দেয়ার মত পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে।

রাষ্ট্র বা সামাজিক ব্যবস্থা মানুষের চরিত্র ও আচার-ব্যবহারকে কিভাবে পাল্টে দেয় তার সম্পর্কে আগে কিছু আলোচনা করা হয়েছে। রাষ্ট্র বা সামাজিক ব্যবস্থা সুনীতি ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে তৈরী হতেই হবে, এর কোন বিকল্প নেই। দোষে গুণেই মানুষ, কিন্তু মানুষ চেষ্টা করে নিজের কু-প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে অনেক উপরে উঠে যেতে পারে। সারা জীবন ধরে নীতির উপর অবিচল থাকার চেষ্টায় সফল হয়েছেন তার প্রমাণও ভুরি ভুরি আছে। এ ধরনের মানুষের হাতেই রাষ্ট্র ব্যবস্থার নেতৃত্ব তুলে দিতে হয়। তবে তার যোগ্যতার দিকটিও দেখতে হবে। এ দুয়ের সমন্বয়ে সবচেয়ে এগিয়ে যে ব্যক্তি তার হাতেই রাষ্ট্রের নেতৃত্ব তুলে দেয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে। সাধারণতঃ এ ধরনের মানুষেরা কখনই নেতৃত্ব নিজের হাতে তুলে নিতে লালায়িত হন না। এদেরকে কিছুটা জোর করেই নেতৃত্বে নিয়ে আসতে হয়। আর এ বাছাইয়ের দায়িত্বও কেবলমাত্র তাদের হাতেই থাকা উচিত যারা সারা জীবন ধরে ন্যায় ও যোগ্যতার ভিত্তিতে নিজেদেরকে উন্নত করার প্রমাণ দেখিয়েছেন। কারন গুণী ব্যক্তিই কেবল অপর গুণী ব্যক্তিকে বিচার করার যোগ্যতা রাখেন। আধুনিক পৃথিবীতে একটি দেশকে অনেক জটিল পরিস্থিতি মোকাবিলা করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হয়। যিনি জাতীয় পর্যায়ে কোন প্রতিষ্ঠানকে নেতৃত্ব দিয়ে সফলতার দিকে কখনও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতা পান নি সে ধরনের মানুষের পক্ষে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নেতৃত্ব দেয়া, বা কে নেতা হবেন তা বাছাই করা অনেকটা অসম্ভব ব্যাপার।

হ্যাঁ, এরকম ভাবে বেছে নেয়া ব্যক্তিরও ভুল হতে পারে, পদত্যাগ হতে পারে। সে ক্ষেত্রে অনেকটা সঙ্গে সঙ্গেই তাকে সংশোধন করার বা প্রয়োজনে সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা থাকতে হবে। যিনি অন্যায়ের পথে পা বাড়িয়েছেন আরও বহুদিন বা আরও কয়েক বছর ধরে তার নেতৃত্ব মেনে চলা মানে দেশের ধ্বংস। আবার যদি দেখা যায় যে রাষ্ট্রনেতা নীতির বিচারে ঠিক আছেন, কিন্তু যোগ্যতার বিচারে পারছেন না, সে ক্ষেত্রেও তাকে সরিয়ে দেয়া প্রয়োজন। রাষ্ট্রনেতাকে সরিয়ে দেয়ার সহজ পদ্ধতি রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত থাকতে হবে। তবে সরিয়ে ফেলার এ ব্যবস্থার মূলেও থাকতে হবে ন্যায় নীতি ও যোগ্যতার বিচার। কিন্তু বর্তমানের প্রচলিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ধরেই নেয়া হচ্ছে যে অন্যায় থাকবেই, আর জনগণের বিশাল আন্দোলন, এমনকি আন্দোলনের মাধ্যমে কিছু মানুষের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত দুর্নীতিবাজ নেতৃত্ব বিনা বাধায় তাদের দুর্নীতি চালিয়ে যেতে পারবে।

২য় পর্যায়

রাষ্ট্র পরিচালনার নতুন ব্যবস্থার প্রস্তাবনা

ক) অভিজ্ঞতালব্ধ দার্শনিক ভিত্তি

আগের আলোচনা থেকে আমরা ধরে নিচ্ছি যে বর্তমানে প্রচলিত গণতন্ত্রের ব্যবস্থাটি ঠিক নয়, এবং পৃথিবীতে বর্তমানে প্রচলিত রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এমন আর কোন ব্যবস্থা নেই যাকে এর বিকল্প হিসেবে দাঁড় করানো যেতে পারে। তাই আমাদেরকে একটি নতুন ব্যবস্থা চিন্তা করতে হবে। তবে আমি মনে করি, যে কোন নতুন ব্যবস্থা গড়তে গেলে তা আমাদের সমাজ জীবনের হাজার বছরের অভিজ্ঞতার মধ্য থেকেই খোঁজা উচিত। হঠাৎ করে একটি অজানা পদ্ধতি জোর করে বসানো ঠিক নয়, যেমনটি করা হয়েছে প্রচলিত গণতন্ত্রে। হাজার বছরের পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের মধ্য দিয়ে জীবন ও প্রকৃতি সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি তাকে কোন কারণ ছাড়া ছুট করে বাদ দিয়ে অপরিষ্কৃত একটি নতুন পদ্ধতি চাপিয়ে দেয়া কখনোই ঠিক নয়। প্রচলিত গণতন্ত্রের যে কুফল আমরা পেয়েছি, বা পৃথিবীর অনেক দেশই পেয়েছে, এটা তারই জন্য। আগের আলোচনা থেকে স্মরণ করতে পারি যে বর্তমানের গণতন্ত্রে বিবাদমান দলভিত্তিক ভোটের ব্যবস্থা কিন্তু সমাজের স্বাভাবিক কোন অভিজ্ঞতা থেকে খুঁজে আনা হয় নি, বিশেষ গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষায়ই হয়ত তা উদ্ভাবন করা হয়েছিল।

প্রশ্ন আসতে পারে যে প্রাচীন যে সমাজের অভিজ্ঞতা আমাদের রয়েছে তা তো ছোট ছোট সমাজের জন্য, যেখানে একটি সমাজের সবাই প্রায় সবাইকে চেনে, জানে। এ অভিজ্ঞতা কোটি কোটি অপরিচিত মানুষ নিয়ে গড়া আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় প্রয়োগ করা যাবে কি? ব্যাপার হচ্ছে এ ছাড়া কোন বিকল্পও নেই। শুরুটা সেভাবেই করতে হবে। ধীরে ধীরে অভিজ্ঞতা থেকে শিখে ব্যবস্থাটিকে সংশোধন করার মাধ্যমেই আমরা হয়ত পেয়ে যাব সুন্দর একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা।

কাঙ্ক্ষিত রাষ্ট্র ব্যবস্থার মাধ্যমে আমরা একটি স্থায়ী সুন্দর সমাজ তৈরী করতে চাই। রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যে ব্যবস্থা নেয়া হবে তার মৌলিক দর্শন ও পদ্ধতির ভেতরেও সুন্দর সমাজের মূল চরিত্রগুলো থাকতে হবে। যদি না থাকে তবে তা কখনই আমাদেরকে সেই কাঙ্ক্ষিত সমাজ উপহার দেবে না, যা আমরা বর্তমানে প্রচলিত গণতন্ত্রের আলোচনায় দেখেছি। সেই কাঙ্ক্ষিত সমাজে আমরা কি কি চাই, তা নিয়ে প্রথমেই একটু আলোচনা হওয়া দরকার।

কাঙ্ক্ষিত সামাজিক বিষয়াদি

১। ন্যায়পরায়ণতা, ন্যায় বিচারের পরিবেশ :

সমাজে সুন্দরভাবে বাঁচার জন্য আমরা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে কিছু ন্যায়-অন্যায়ের ধারণা তৈরী করি এবং সে ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চাই। ন্যায় বিচারের পরিবেশের মূল ভিত্তিই হচ্ছে ন্যায়-নীতিবোধ। ন্যায় বিচার তখনই পাওয়া যাবে যখন এর বাস্তবায়নকারী ব্যক্তি বা সংস্থা ধনী-গরীব, পরিচিত-অপরিচিত, আত্মীয়-অনাত্মীয়, ধর্ম-বর্ণ, পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে সবাইকে সমান চোখে দেখবে ও তাদের মধ্যে ভেদাভেদ করবে না (বর্তমান গণতন্ত্রের নীতিমালায় এ বিষয়গুলো লিখা থাকলেও দলীয় প্রভাবের কারণে ন্যায় বিচার পাওয়া প্রায় অসম্ভবের পর্যায়ে চলে গেছে)।

ছোটবেলায় একটি গল্প পড়েছিলাম। দু বন্ধু দেশ ভ্রমণে গিয়ে দেখল যে এক রাজ্যে ঘি ও তেলের দাম সমান। এক বন্ধু সেখানে থেকে গেল, কারণ তাহলে সে প্রতি বেলায় ঘি খেতে পারবে। অন্য বন্ধু, যে একটু জ্ঞানী ও চিন্তাশীল, সে বলল যেখানে ঘি ও তেলের দাম সমান, সেখানে ন্যায়-অন্যায়, গুণ-দোষের

কোন বিচার হবে না, তাই সেখানে না থাকাই উচিত। এদিকে ঘি খেয়ে খেয়ে প্রথম বন্ধু অনেক মোটাতাজা হয়ে গেছে। একসময় রাজার বাড়ীতে একটি চুরি হলে চোরকে শুলে চড়াবার ব্যবস্থা হল। কিন্তু রাজার শখ হল যে মোটাতাজা কাউকে যেন শুলে চড়ানো হয়, সে চোর হোক বা না হোক। তখন সেই প্রথম বন্ধুই হল তার শিকার, যদিও সে চুরির সঙ্গে কোনভাবেই জড়িত ছিল না। তাই ন্যায় পরায়ণতা ও ন্যায়ের বিচার একটি সমাজের মূল জীবনীশক্তি। আমাদের কাঙ্ক্ষিত রাষ্ট্রব্যবস্থায়ও এর অন্যথা হলে চলবে না।

২। পারস্পরিক বিশ্বাস, সম্মান, ভালবাসা, সহমর্মিতা, সহযোগিতা, ইত্যাদি :

এ গুণগুলো মানুষের চরিত্রকে বিকশিত করে সুন্দর সমাজ তৈরী করে। আমরা যে সমাজকে খুঁজছি, সে সমাজে এ গুণগুলির বিকাশ হোক তাই আমরা চাই। তাই রাষ্ট্র বা সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে এ গুণগুলি যেন বিকশিত হয় সে ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। ভাল গুণের বিকাশের উদ্দেশ্যে ভাল গুণের চর্চা হওয়া প্রয়োজন, ভাল গুণের অ্যাপ্রিসিয়েশন ও সামাজিক পুরস্কার থাকা প্রয়োজন। ন্যায় বিচারে যে সব মানুষেরা এ সব গুণে নিজেদেরকে গুণান্বিত করতে পারছেন বলে মনে হয় তাদেরকে সম্মাননা দেয়া, চাকুরীক্ষেত্রে উন্নতি দেয়া, প্রচারমাধ্যমে তাদেরকে তুলে ধরা, এ ব্যবস্থাগুলো থাকা প্রয়োজন। তাদেরকেই স্থানবিশেষে নেতৃত্বের আসনে বসালে এ গুণগুলো আরও বিকাশ লাভ করবে। সাধারণ শ্রমিক, কৃষক থেকে শুরু করে সবচেয়ে জ্ঞানী গুণী ও দায়িত্বের আসনে আসীন সবাইকেই সমানভাবে বিচার করে এসব ভাবে পুরস্কৃত করতে হবে। তার জন্য রাষ্ট্র বা সমাজের প্রতিটি পর্যায়ে ব্যবস্থা রাখতে হবে। যে ব্যবস্থায় দেখা যাবে যে কম গুণী ও কম যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি তার থেকে বেশী গুণী ও বেশী যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির উপরে স্থান পাবে, বুঝতে হবে যে সে ব্যবস্থায় গলদ আছে, এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সংশোধনের মাধ্যমে সে ব্যবস্থার পরিবর্তন আনা উচিত হবে।

৩। গুণের চর্চা ও প্রচার এবং দোষকে চুপিসারে বন্ধ করাঃ

আমরা সবাই দোষে গুণে মানুষ। কেউই মহাপুরুষও নয়, আবার মহাপশুও নয়। পরিবেশ এবং নিজের চেষ্টা— এ দুয়ে মিলে মানুষ ভালর দিকেও যেতে পারে, আবার খারাপের দিকেও যেতে পারে। সমাজে স্বাভাবিকভাবে আমরা কি করি? একে অপরের গুণ গুলোকেই জনসমক্ষে প্রকাশ করে থাকি, আর দোষগুলোকে ঢেকে রাখি। কেবলমাত্র ঘনিষ্ঠজনেরাই লোকচক্ষুর আড়ালে ঘনিষ্ঠজনের দোষ ধরিয়ে দিয়ে তাকে সংশোধনের চেষ্টা করি। কিন্তু যথেষ্ট খেয়াল রাখি যে তার আত্ম-সম্মান যেন কোনভাবেই নষ্ট না হয়, আর জনসমক্ষেও তার সম্মান যেন ক্ষুণ্ণ না হয়। তাই ভাল গুণকে বিকশিত করার জন্য প্রচার মাধ্যম সহ বিভিন্নভাবে ভাল গুণের চর্চা হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু দোষের সংশোধন প্রাথমিকভাবে করতে হয় চুপিসারে, যেন তার প্রচার না হয়। কারণ দোষের প্রচার হলে তার চর্চাও বাড়বে, আরও মানুষ তা করে দেখার চেষ্টা করবে। যদি কোন দোষ জনসমক্ষে প্রকাশ পেয়ে যায়, তবে কেবল তা বন্ধ করার ব্যবস্থাই প্রকাশ্যে করা ভাল। যে কোন দোষকে বন্ধ করার জন্য প্রাথমিকভাবে পরামর্শ দেয়ার ব্যবস্থা রাখা দরকার। তাতে কাজ না হলে সাবধান করার ব্যবস্থা থাকতে হবে। তাতেও কাজ না হলে শেষ পর্যন্ত শাস্তির ব্যবস্থা থাকবে।

৪। ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিবেশ :

ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিবেশ পাওয়া মানুষের মৌলিক অধিকার। ব্যক্তির নিজস্ব ধারণা—চিন্তা, ইচ্ছা—অনিচ্ছা, সুখ—দুঃখ ভীতিহীনভাবে প্রকাশ করার পরিবেশ সমাজে থাকা দরকার, তবে তার সাথে অবশ্যই থাকতে হবে সামাজিক দায়িত্বের সীমাবোধ, ও অপরের স্বাধীনতার প্রতি সম্মানবোধ (আগের আলোচনায় দেখেছি, দলভিত্তিক গণতন্ত্র ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিবেশ নষ্ট করে)। সুস্থ স্বাধীন পরিবেশই একজন নাগরিককে নিজের থেকে দায়িত্বসম্পন্ন করে তোলে যা আইন ও শাস্তির মাধ্যমে কখনও সম্ভব নয়। তারপরও যদি কেউ সীমা লঙ্ঘন করে তার জন্য থাকবে প্রথমে উপদেশ, পরে সাবধান বানী, ও কেবলমাত্র চূড়ান্ত পর্যায়ে শাস্তির ব্যবস্থা। তবে ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিবেশ বজায় থাকলে এ ধরনের মানুষ পাওয়া যাবে শতকরা মাত্র কয়েকজন, নিজের

উপর যারা নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে না। বেশীরভাগ মানুষই কিন্তু সুস্থ পরিবেশ পেলে নিজের থেকেই দায়িত্বশীল হয়ে যায়। পাঠক, আপনার নিজেকে নিয়েই ভেবে দেখুন।

৫। নীচ থেকে উপর মুখী ক্ষমতার পরিবেশ :

বর্তমানের উপর থেকে নীচ মুখী প্রশাসন ব্যবস্থাটি সম্পূর্ণ রাজতন্ত্রের আদলে গড়া, যা নিয়ে আগে আলোচনা হয়েছে। আর উপরের কর্মকর্তা যদি দুর্নীতিপরায়ণ হয় তবে এ ব্যবস্থা অধীনস্থ কর্মচারীকেও শেষ পর্যন্ত দুর্নীতিপরায়ণ করে তোলে। তাই নীচ থেকে উপরমুখী মূল্যায়নের পরিবেশ তৈরী করতে হবে। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রেরা শিক্ষকের মূল্যায়ণ করে, এবং সে ভিত্তিতে শিক্ষকের নিয়োগ বহাল রাখার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে থাকে। নতুন রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সরকারী কর্মচারী, পুলিশ, বিচারক, সর্বক্ষেত্রেই নিয়োগ ও বরখাস্তের ব্যাপারে জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণের কিছু ব্যবস্থা থাকা দরকার। প্রস্তাবিত নতুন ব্যবস্থায় প্রতিটি এলাকার প্রশাসন, পুলিশ, বিচার ব্যবস্থা এলাকার মানুষের হাতেই থাকবে, বাইরে থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসা ব্যক্তিদের হাতে নয়। নাটোরের লাঠি বাঁশী সমিতির কথা সবার হয়ত মনে আছে। এ মডেলটি নিয়ে অনেক চিন্তা ভাবনা করার দরকার আছে। পুলিশ বাহিনীর পিছনে সরকারের বিশাল খরচ ছাড়াই এ সমিতি নাটোরকে অপরাধমুক্ত রেখেছিল অনেক দিন। এতে সৎ পুলিশ কর্মচারীরা কিন্তু খুশীই হয়েছিলেন।

সব ক্ষেত্রেই আমরা ক্ষমতার নিম্নমুখী ব্যবস্থার বিপরীতে চিন্তা ভাবনা করতে পারি। যে জনগণকে একজন সিভিল সারভেণ্ট সেবা দিচ্ছেন, তার কাজের মূল্যায়ণ বা গোপনীয় রিপোর্ট তার সেবাগ্রহণকারীরা দেবেন, ঐ সার্ভিসে তার উপরওয়ালা নয়। তবে এ ব্যবস্থাগুলো নিয়ে আরও অনেক চিন্তাভাবনা করার দরকার আছে, এবং সময় নিয়ে আস্তে আস্তে করা যাবে, যদি দেশের সর্বোচ্চ পর্যায়ে যোগ্য ও আন্তরিক নেতৃত্ব আগে আনা যায়। মূল বিষয়টি হচ্ছে, জনকল্যাণ আসতে পারে সুযোগ্য নেতৃত্ব থেকে, নির্বাচিত প্রতিনিধি থেকে নয়।

৬। সম্পদের সুষম বন্টনঃ

সম্পদের সুষম বন্টনের মাধ্যমে সমাজের অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার পরিবেশ থাকতে হবে। তবে অতীতের বৈষম্যের কারণে যারা বঞ্চিত হয়েছে তাদেরকে এগিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা প্রাথমিকভাবে বাড়তি প্রাধান্য পাওয়া উচিত।

এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার মূল ভিত্তি হবে যে দেশের সম্পদের উপর প্রতিটি নাগরিকের সমান অধিকার। প্রতিটি নাগরিকের সমান আয় থাকার কথা। কিন্তু হাজার বছরের ভুল নীতিমালার কারণে তা লঙ্ঘিত হয়েছে, মানুষে মানুষে আকাশচুম্বী বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে। একই সময়ের পরিশ্রমের বিনিময়ে দেশের মধ্যেই এক ব্যক্তি অপরজনের চেয়ে কয়েক শতগুণ বেশী পাচ্ছে, আর পৃথিবীতে এ বৈষম্য আছে কয়েক হাজার গুণের। একদিনে তা দূর করা যাবে না, কিন্তু সব নীতিমালার মধ্যে বৈষম্য কমানোর লক্ষ্যটি যেন থাকে তা দেখতে হবে। তবে বর্তমানের অর্থনীতির মত দরিদ্রকে একদিকে শোষণ করে কিছু ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর হাতে সম্পদ কুক্ষিগত করে তারপর কিছু দরিদ্র ব্যক্তিকে বেছে নিয়ে তাদেরকে দান-দক্ষিণা করে লোক দেখানোর মত ভাওতাবাজী যেন না থাকে তা দেখতে হবে। সাবসিডি, দরিদ্র-ভাতা, ইত্যাদি করুণা দেখানো ব্যবস্থাগুলো কখনোই কাঙ্ক্ষিত নয়। একে তা সত্যিকারের যোগ্য প্রার্থীর কাছে পৌঁছায় না। দ্বিতীয়তঃ নিয়মিত এ ধরনের ভাতা মানুষকে মনের দিক থেকেও দুর্বল করে ফেলে। সে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে, আর কখনই নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে না, চিরদিনের মত ভিক্ষুক হয়ে যায়। আর একটি জিনিস আমরা করছি, তা হল দরিদ্র দূরীকরণের কথা বলে দরিদ্রের শ্রমকে সস্তায় ধরে রাখার ব্যবস্থা। মুক্ত বাজার অর্থনীতির মত বড় বড় কথা বলে ধনীর হাতে সব নিয়ন্ত্রণ তুলে দিয়ে মূলতঃ আমরা দরিদ্রকে লালন করছি। যেমন বর্তমানের পরিস্থিতিতে আমরা চাইব যে গার্মেন্টস শিল্পের কর্মীদের বেতন ভাতা না বাড়ে, কারণ তাহলে পাশ্চাত্যর বাজার হাতছাড়া হয়ে যাবে। তাই পাশ্চাত্যের ধনীদের প্রণয়ন করা মুক্ত বাজারের এ পদ্ধতিতে দরিদ্রকে আমরা দরিদ্রই রেখে দিতে চাইব। এর বিকল্প চিন্তা করতে হবে।

প্রতিটি মানুষের মেধা, উদ্ভাবনী ক্ষমতা ও নিজের হাতের দক্ষতা ব্যবহার করে অর্থোপার্জনের স্বাধীন পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে তা করতে হবে। আমাদের লক্ষ্য থাকতে হবে সবার আয় সমান করার, যেন একজনের একঘণ্টার পরিশ্রমের মূল্য অপর যে কারও এক ঘণ্টা পরিশ্রমের মূল্যেরই সমান হয়। পুরোপুরি হয়ত সেখানে পৌঁছুতে পারব না, কিন্তু লক্ষ্য থাকতে হবে এ আদর্শ ব্যবস্থাকে সামনে রেখেই। বিশেষ আন্তরিকতা নিয়ে, সবার সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে নীতিমালা ও কাজের পদ্ধতি নির্ধারণ করতে হবে, আর সার্বক্ষণিক ফলাফল পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিবর্তন আনতে হবে। ফলাফলের উপর ভিত্তি করে সংশোধনের ব্যবস্থাটি ভীষণ জরুরী, এবং সংশোধনের সহজ ব্যবস্থা থাকতে হবে সে পদ্ধতিতে। রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যেই এ ব্যাপারগুলি থাকতে হবে।

মোদা কথা, এমন একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা আমরা খুঁজছি যে ব্যবস্থা হবে জনকল্যাণমুখী, যা হবে মানুষের বিশ্বাস ও সুন্দর গুণগুলোর উপর নির্ভরশীল, যা দেশের প্রতিটি মানুষের সুন্দর জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাবে ও তা বাস্তবায়ন করবে।

রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বিশ্বাসের অবস্থান

জীবনের একটি বিষয় আমাদের সম্পর্কে পরিষ্কার হতে হবে। প্রতিটি মানুষ মূলতঃ ভাল হওয়ার এবং থাকার চেষ্টা করে। প্রত্যেকের মধ্যেই ভাল গুণাবলীর প্রতি আকর্ষণ ও অন্যায়ের প্রতি বিকর্ষণের একটি সহজাত প্রবৃত্তি আছে। কিন্তু অন্যায় ও অবিচারের পরিবেশ তাকে নষ্ট করে। পাঠক, আপনি আপনার নিজের জীবনেই দেখুন। জীবনে জেনে শুনে কিছু অন্যায় নিশ্চয়ই করেছেন। ইতিহাস টেনে দেখুন, আপনার উপর ক্ষমতাবান কোন ব্যক্তির অন্যায় বা অবিচারের সূত্র ধরেই আপনি হয়ত তা করেছেন। ধরুন বাবা বা স্কুল শিক্ষক হয়ত ভুল বিচার করে আপনাকে শাস্তি দিয়েছেন, এবং পরেও তার কোন প্রতিকার করেন নি। যেহেতু তারা আপনার থেকেও ক্ষমতাবান, তাদের বিরুদ্ধে আপনি তাৎক্ষণিক কিছু করতে পারেন নি। কিন্তু এ অন্যায়ের প্রতিক্রিয়ায় আপনি হয়ত পরে অন্য কোন অন্যায় কাজ করে বসেছেন। যদি প্রথমেই সেই অবিচারটি না হত, অথবা তার প্রতিকার হত, তা হলে পরের সে অন্যায়টি আপনি হয়ত করতেন না। এখানে বাবা বা স্কুল শিক্ষক তো আপনার ভালবাসার ও সম্মানের মানুষ, সেখানেই এ ধরনের প্রতিক্রিয়া কাজ করে। আর কর্মজগতে যখন দেখবেন দুর্নীতিবাজ সরকারী কর্মচারী, পুলিশ সদস্য, রাজনৈতিক নেতা, বা বিচারক আপনার উপর অন্যায় বিচার করছে, তখন আপনার প্রতিক্রিয়া কি হবে? দেশে অনেক সম্ভ্রাসীর ইতিহাসে আমরা দেখেছি কি ভাবে এধরনের অন্যায় বিচারব্যবস্থা তাদেরকে সম্ভ্রাস ও দুর্নীতির দিকে ঠেলে দিয়েছে।

তাই রাষ্ট্র ব্যবস্থাটি হতে হবে বিশ্বাসের ভিত্তিতে। তাহলে বিশ্বাসী ও ন্যায় পরায়ণ ব্যক্তি সেখানে সহজ বোধ করবে। আর রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভিত্তি যদি হয় অবিশ্বাস, এবং অবিশ্বাসকে পাহারা দেবার জন্যই সব নীতিমালা ও নিয়ম কানুন তৈরী হয় তবে তা বিশ্বাসী ও ন্যায় পরায়ণ ব্যক্তির জন্য কঠিন হয়ে যাবে। ধীরে ধীরে অবিশ্বাস ও অন্যায়ই এর মাধ্যমে বিকাশ লাভ করবে। প্রশ্ন আসতে পারে যে বর্তমানের সব দুর্নীতিবাজ বা সম্ভ্রাসীরা বিশ্বাসের উপর সৃষ্ট নতুন যে কোন ব্যবস্থাকে নষ্ট করবে। কিন্তু দেখবেন যদি বিশ্বাস ও ন্যায় বিচারের পরিবেশ তৈরী হয়, এরাও ধীরে ধীরে ভাল হয়ে যাবে। কারণ প্রতিটি মানুষের মধ্যে ভাল গুণাবলীর একটি আকর্ষণ আছে, পরিবেশের কারণে সে যতই নষ্ট হোক না কেন। ন্যায় বিচারের পরিবেশ তৈরী করে প্রথমতঃ এদেরকে পরিবর্তনের সুযোগ দিতে হবে, প্রথমেই শাস্তি দেয়া উচিত হবে না। এ সুযোগ দেয়া সত্ত্বেও যারা নিজেদেরকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে পারবে না তাদের জন্য বিচার ও জেল ব্যবস্থা তো থাকছেই। পরিচিত একজন সেদিন বলছিলেন যে কুখ্যাত খুনী এরশাদ শিকদার, যে কমপক্ষে ৬০ জন মানুষ খুন করে শেষ পর্যন্ত ফাঁসিকাঠে ঝুলেছে, শেষ ইচ্ছায় সে তার স্ত্রীকে অনুরোধ করেছে তার কন্যাসন্তানটিকে যেন ‘বি এড’ পড়ানো হয়। অর্থাৎ কন্যাকে সে একজন শিক্ষক হিসেবে দেখতে চায়। এ থেকেই বোঝা যায় নিজের জীবনকে সে নিশ্চয়ই অন্তর থেকে ঘৃণা করেছে। হয়ত পরিবেশের কারণেই সে সম্ভ্রাসী হয়েছে, যা কখনোই তার কাঙ্ক্ষিত পেশা ছিল না।

অবিশ্বাসের ভিত্তিতে তৈরী নীতিমালা মানুষকে যে দুর্নীতিপরায়ণ করে তোলে একটি উদাহরণ দিয়ে তা বোঝানো যেতে পারে। আমাদের কর নীতিমালার একটি মূল ধারণা হচ্ছে যে সবাই কর ফাঁকি দিতে চায় – অর্থাৎ মানুষকে অবিশ্বাস। অতএব এমনভাবে ব্যবস্থাকে কঠিনের পর কঠিন করা হয় যেন ফাঁকি দেয়ার অবকাশ না থাকে। এর ফলে কর প্রশাসনে নিয়োজিত ব্যক্তিদের ক্ষমতা অনেক বেড়ে যায়, আর তারাই আপনাকে কর ফাঁকি দিতে প্রলুব্ধ করে। শুধু প্রলুব্ধ করাই নয়, আপনি যদি তাদের প্রস্তাব অনুযায়ী না চলে সৎ থাকতে চান, তাহলে আপনাকে বিভিন্নভাবে হয়রানী করা হবে। আপনার আয়ের সত্য স্টেটমেন্টকে মিথ্যা আখ্যায়িত করে, আপনার আয় অনেক বেশী হয়েছে দাবী করে এমন অবস্থায় ফেলবে যে আপনি সীমাহীন হয়রানীর শিকার হবেন। আপিল কোর্টে আপনার সত্যিকারের আয়ের পরিমাণ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে দেখবেন সেখানেও দুর্নীতি। তখন নিছক হয়রানী থেকে বাঁচার জন্য ঘুষ দিয়ে কর ফাঁকি দিতে বাধ্য হবেন। আপনার সারা জীবনের পেনশনের সঞ্চয় তুলতে গিয়ে যখন দেখছেন যে ঘুষ না দিলে জীবিত অবস্থায় তা তুলতে পারছেন না, তখন কি আপনিও বাধ্য হবেন না ঘুষ দিতে? শিল্প-উদ্যোক্তা বা ব্যবসায়ীদের জন্যও, বিশেষ করে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য অনেক সময় তা হয়ে যায় বাঁচা-মরা সমস্যা। নিজের সমস্ত পুঁজি ঢেলে প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে যখন এ অবস্থায় পৌঁছে তখন কেবল নিজের ধ্বংস থেকে বেঁচে থাকার জন্য তাকে দুর্নীতিতে সায় দিতে হয়।

তা ছাড়া দুর্নীতির পরিবেশ চলতে থাকলে দেখবেন যে আপনার থেকেও অনেক বেশী আয় করে অন্যেরা অনেক কম কর দিয়ে দিব্যি ভাল আছে। তখন আপনিও উৎসাহিত হবেন দুর্নীতি করতে। আবার যে কর্মচারী সৎ থাকার চেষ্টা করবে তাকেও বদলী ও অন্যান্য হয়রানী করে, এমনকি তাকে মিথ্যাভাবে অসৎ আখ্যায়িত করে, অপমান করে, চাকুরী থেকে তাড়িয়ে দেয়া হবে। এ পরিবেশ তখন কেবল দুর্নীতি ছড়াবে।

অথচ যদি কর ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হত বিশ্বাস, করের পরিমাণ যদি হত যৌক্তিক এবং কর কর্মচারীদের দৌরাত্ম বন্ধ করে কর প্রদানের পদ্ধতি যদি খুব সহজ করে ফেলা হত, তাহলে প্রথমে হয়ত কর ফাঁকি দেয়ার কিছু প্রবণতা লক্ষ্য করা যেত পিছনের অবিশ্বাসের ইতিহাসের কারণে, কিন্তু ধীরে ধীরে তা পরিবর্তন হয়ে ফাঁকি দেবার ঘটনা খুবই কমে যেত। প্রতিটি মানুষের মধ্যেই দুর্নীতি ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে একটি মানসিক বাধা থাকে। কিন্তু একবার দুর্নীতি শুরু করলে এ মানসিক বাধাটি সরে যায়। তখন খুব তাড়াতাড়ি মানুষ হিসেবে তার অধঃপতন হয়।

আপনার অফিস বা ঘরেই তাকিয়ে দেখুন না কেন। যদি অফিসে কেউ কাউকে বিশ্বাস না করতেন তাহলে কলম-পেন্সিল-কাগজ প্রতিটি জিনিসই তালা চাবি দিয়ে রাখতে হত। ঘরে পরিবারের সদস্যদের মধ্যেও যদি এমন অবিশ্বাস থাকত তাহলে সারা ঘরে কেবল তালা পর তালা থাকত, আর ঝগড়া চলত দিন রাত। আর এ সন্দেহ আর অবিশ্বাস আপনার সন্তানদেরকে কেমন মানুষ হিসেবে তৈরী করত? আর একটি প্রকট উদাহরণ দিয়ে এ পর্ব শেষ করছি। আমাদের দেশে বা পৃথিবীতে অনেক ঘটনা ঘটেছে যেখানে স্বামী তার স্ত্রীকে আঘাত করেছে বা হত্যা পর্যন্ত করেছে। এখন যদি আমরা নীতিমালা তৈরী করি যে এ ধরনের অঘটনের কোন ঝুঁকিই আমরা নিতে চাই না, তাই সব স্বামী স্ত্রীকে আলাদা আলাদা বাসায় বা আলাদা ঘরে তালা দিয়ে বাস করতে হবে। প্রথম প্রশ্নই হবে, যে এ ধরনের জীবনের জন্য বাঁচার কোন অর্থ আছে কি? তার মানে বিশ্বাসের ঝুঁকি আমাদের নিতেই হবে। যেখানে তা ব্যর্থ হবে, সে খানে বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে, কিন্তু তার জন্য সবার সহজ জীবনকে নষ্ট করা যাবে না। আমরা ঝুঁকি কোথায় নিই না? গাড়ীতে, বিমানে, লঞ্চে, দুর্ঘটনা হয়ে প্রাণ চলে যেতে পারে। তাই বলে কি আমরা এগুলোতে চড়া বন্ধ করে দিয়েছি? ভূমিকম্পে নিজের ঘরের মধ্যে থেকেও প্রাণ চলে যেতে পারে। ঝুঁকির মধ্যে বাস করেই আমরা প্রতিনিয়ত চেষ্টা করে যাই ঝুঁকি কিভাবে কমানো যায়। তাই রাষ্ট্র পরিচালনাতেও বিশ্বাস ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে কিছুটা ঝুঁকি নিতেই হবে। তাই বিশ্বাসকে মূল ভিত্তি হিসেবে নেয়ার কোন বিকল্প নেই।

রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ভুল স্বীকার করা ও তার সংশোধনের সুযোগ

আর একটি বিষয় হচ্ছে ভুল থেকে শিক্ষা নেয়ার সুযোগ। কারণ আমরা মানুষ, এবং মানুষমাত্রই ভুল করে। আগের আলোচনায় আমরা দেখেছি প্রচলিত দলভিত্তিক গণতন্ত্রের ব্যবস্থায় তা সম্ভব নয়। তাই আমরা যে ব্যবস্থা খুঁজব সেখানে রাষ্ট্র পরিচালনায় ভুল স্বীকার করার মানসিক পরিবেশ থাকতে হবে ও তাৎক্ষণিকভাবে তা সংশোধন করে নেয়ারও সুযোগ থাকতে হবে। অর্থাৎ সেখানে নেতৃত্বে জীবন বোধের প্রয়োজন আছে, যোগ্যতার প্রয়োজন আছে, উন্নত মানসিকতার প্রয়োজন আছে, ভুল স্বীকার করে নিজেকে সংশোধন করতে যার কোন দ্বিধা হয় না। পাশাপাশি একটি আস্থা ও ত্যাগের পরিবেশও থাকতে হবে সেখানে।

ছোট সমাজের অভিজ্ঞতা

মনে করুন সমুদ্রে জাহাজডুবি হয়ে বিশ-পঁচিশজনের একটি দল জনশূণ্য একটি দ্বীপে গিয়ে উঠেছেন। দেখা যাবে যে ব্যক্তিটি সেখানে জ্ঞানে গুণে ও উদ্ভাবনে সেরা, নিজের মান অপমানের তোয়াক্কা না করে অন্য সবার সম্মান রক্ষা করে, মান-অভিমান ভাঙিয়ে সবাইকে মিলিত করে সবার জন্য বাঁচার ব্যবস্থা করতে পারে সেই ধীরে ধীরে অবিসম্বাদিত নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। অন্য সবাই তাকে যথাসম্ভব সহযোগিতা দেয়, আর সে নেতাও সবার জন্য জীবন উৎসর্গ করে ত্যাগের আদর্শ স্থাপন করে। ষাটের দশকে এইচ এস সি ইংরেজী পাঠ্যবইএ ‘অ্যাডমিরেবল ক্রাইটন’ নামে একটি গল্প এরকম একটি অবস্থাই তুলে ধরা হয়েছিল। আমাদের দেশেও এ ধরনের অজস্র উদাহরণ পাওয়া যাবে। বঙ্গোপসাগরে কোন একটি ঘূর্ণিঝড়ের পর একটি নৌকা থেকে একদল মানুষকে উদ্ধার করার একটি গল্প কোন একজন হেলিকপ্টার পাইলট পত্রিকায় লিখেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন যে একটি শক্ত সমর্থ তরুণ প্রতিবারই অন্যদেরকে সাহায্য করে হেলিকপ্টার থেকে ফেলা দড়িতে বেঁধে দিতে সাহায্য করছিল। কিন্তু সবাইকে না উঠিয়ে নিজে উঠতে অস্বীকার করছিল। শেষ পর্যন্ত সমুদ্রের তান্ডবে নৌকা ডুবে যায়। ফিরে এসে ঐ তরুণকে আর উদ্ধার করতে পারেন নি হেলিকপ্টার পাইলট। মাত্র কিছুদিন আগে ঢাকার কাওরান বাজারের একটি উঁচু ভবনে আগুন লাগলে নিজের জীবনের বিনিময়ে অন্যের জীবন বাঁচাবার একই নিঃস্বার্থ উদাহরণ আমরা দেখেছি। সবাইকে নিরাপদে নামিয়ে দিয়ে একটি টেলিভিশন চ্যানেলের সর্বোচ্চ ব্যক্তি নেমেছেন সবার পরে। যোগ্য ও আস্থাশীল নেতৃত্বের ব্যবস্থা মানুষের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ত্যাগের মনোভাব এনে দেয়।

আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে অনেক যোগ্য ব্যক্তি অনেক ত্যাগ স্বীকার করে এলাকার মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে, যেখানে তার নিজের কোন প্রচার বা স্বার্থ দেখা যায় না। জীবন যুদ্ধের জন্য তারা নিজেদেরকে তৈরী করে (self made) বড় হয়ে থাকেন। মানুষ তাদেরকে স্বাভাবিকভাবেই সামাজিক কর্মকাণ্ডে নেতা হিসেবে মেনে নিচ্ছে, তাদের নেতৃত্বে সবাই একযোগে কাজ করে যাচ্ছে, মাঝে মাঝে পত্রিকায় এর দু একটি ছাপা হয় মাত্র। এ ধরনের মানুষেরা কিন্তু কখনও নেতৃত্ব চান না, জনগণই তাদেরকে জোর করে নেতৃত্বের আসনে বসায়। কারণ তারা জানে যে নেতৃত্বে দায়িত্ব কতখানি, এবং তা সহজ কাজ নয়। বরঞ্চ অপরের নেতৃত্ব স্বীকার করে নিয়ে তাকে সব রকমের সহযোগিতা দিতে তারা বেশী আগ্রহী। এ ধরনের মানুষদেরকে খুঁজে বের করে তাদের উপর আস্থা স্থাপন করে নেতৃত্ব দিতে পারলে সমাজের সবচেয়ে বেশী উপকার হয় ও জনজীবনে কল্যাণ আসে।

খ) নতুন সরকার ব্যবস্থার প্রস্তাবনা

১। জনগণের আস্থাভাজন যোগ্য নেতৃত্ব – ‘রাষ্ট্রনেতা’ঃ

উপরে যে ছোট ছোট সমাজের কথা বলা হল সে অভিজ্ঞতা থেকেই আধুনিক রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যবস্থার ধারণা আমাদের নিতে হবে। সে অভিজ্ঞতায় রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য আমি জনগণের আস্থাভাজন যোগ্য নেতৃত্বের প্রস্তাবনা করছি। এ অবস্থানটির নাম আমি বর্তমানের মত প্রেসিডেন্ট, রাষ্ট্রপ্রধান বা প্রধানমন্ত্রী এর কোনটিকেই পছন্দ করছি না। বরঞ্চ ‘রাষ্ট্রনেতা’ বা কাছাকাছি কোন অর্থবোধক নামে এ অবস্থানটিকে ডাকতে চাইব। আপাততঃ ‘রাষ্ট্রনেতা’ নামটিই ব্যবহার করা যাক। তিনি সবার সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেবেন ও প্রয়োজনীয় দেশকে নেতৃত্ব দেবেন।

২। রাষ্ট্রনেতা নিয়োগ প্রক্রিয়াঃ

এটিই নতুন প্রস্তাবনার নতুন ও উল্লেখযোগ্য দিক। জনগণের সঙ্গে সম্পৃক্ত রেখে যোগ্য, সৎ ও আস্থাভাজন ব্যক্তিকে কি ভাবে রাষ্ট্রনেতা হিসেবে বাছাই করা যায় ও নিয়োগ দেয়া যায় তার প্রক্রিয়াটিই আমার এ প্রস্তাবনার উদ্ভাবন ও বৈশিষ্ট্য। রাষ্ট্রনেতার কোন দল থাকবে না, সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত গুণাবলী ও যোগ্যতার বলে তাকে বাছাই করা হবে। পাঁচ বছরের জন্য একজন রাষ্ট্রনেতাকে নিয়োগ দেয়া হবে। এ সম্পর্কে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

৩। মন্ত্রী বা উপদেষ্টা নিয়োগ ও জবাবদিহিতা :

রাষ্ট্রনেতা সমগ্র দেশকে নেতৃত্ব দিয়ে জনগণকে সামগ্রিক কল্যাণের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। একজন গুণী ও যোগ্য ব্যক্তি সহজেই অপর গুণী ও যোগ্য ব্যক্তিকে চিনে নিতে পারেন। তাই নিজের বাছাই করা কিছু ব্যক্তিবর্গকে মন্ত্রী বা উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দিয়ে রাষ্ট্রনেতা দেশ পরিচালনা করবেন, কিন্তু জনগণের কাছে জবাবদিহিতা করতে হবে একা তাকেই। মন্ত্রী বা উপদেষ্টাদের জবাবদিহিতা হবে রাষ্ট্রনেতার কাছে। প্রয়োজনে তাদের যে কাউকে যে কোন সময়ে রাষ্ট্রনেতা পরিবর্তন করতে পারবেন। রাষ্ট্রনেতা বলতে পারবেন না যে অমুক মন্ত্রী আমার কথা শুনছে না, ইত্যাদি।

৪। রাষ্ট্রনেতার জবাবদিহিতা ও তার সরকার অপসারণের ব্যবস্থাঃ

জনগণের কাছে নিয়মিতভাবে রাষ্ট্রনেতার মূল্যায়ণ ও জবাবদিহিতার, এবং প্রয়োজনে তার সরকারকে সম্মানজনকভাবে অব্যাহতি দেবার একটি সুষ্ঠু ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন, যার প্রক্রিয়া যেন খুব সময়সাপেক্ষ বা কঠিন না হয়, আবার খুব সহজও না হয়। এ প্রস্তাবনা নিয়ে পরে আলোচনা করব।

৫। ন্যায়পাল, বিচার ব্যবস্থা ও গণপ্রচারমাধ্যম – পরামর্শের মাধ্যমে রাষ্ট্রনেতার ভুল সংশোধনের জন্য :

পরামর্শ দিয়ে রাষ্ট্রনেতার ভুলভ্রান্তি সংশোধন করার জন্য একজন ‘ন্যায়পাল’ এর ব্যবস্থা থাকবে, আর থাকবে গণপ্রচার মাধ্যম ও বিচার ব্যবস্থা। এর প্রতিটিই হবে স্বাধীন। একজন ব্যক্তিবিশেষের অভিযোগ ও মতামতেরও যেন গুরুত্ব দেয়া হয় সে ব্যবস্থা তৈরী করার লক্ষ্যে চেষ্টা করে যাওয়া হবে।

৬। নীচ থেকে ক্ষমতার ধারা, জনগণের অংশগ্রহণঃ

সরকার ব্যবস্থাতেও বড় রকমের একটা পরিবর্তন থাকবে প্রস্তাবিত এ ব্যবস্থায়। এখানে ক্ষমতা হবে নীচ থেকে উপরে। জনগণ তাদের ভাগ্য গঠনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে। দেশের নীচ থেকে উপর সব ক্ষেত্রেই একই ধারণায় ও পদ্ধতিতে যোগ্য ও আস্থাশীল নেতৃত্বের মাধ্যমে প্রশাসন ব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে হবে। যেমন একটি গ্রামের জনগণ মিলে একই ধরনের প্রক্রিয়ায় একজন নেতা ও ন্যায়পাল বাছাই করবে। এতে জনগণও সরাসরি গ্রামের সরকার ব্যবস্থায় অংশ গ্রহন করতে পারবে। এটি অনেকটা আগের স্থানীয় সরকারের ধারণার কাছাকাছি, তবে দেশের শীর্ষের সরকার ব্যবস্থা দল ভিত্তিক হওয়ায় তা সফল হয় নি।

আবার অনেকগুলো এলাকা মিলে একজন ব্যক্তি নেতৃত্ব বেছে নিয়ে তাদের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের সমন্বয় ঘটাবে। আর সে ব্যবস্থাকে গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, ও অবকাঠামো তৈরী করার ব্যবস্থা নেবেন রাষ্ট্রনেতা ও তার সঙ্গে থাকা মন্ত্রী বা উপদেষ্টারা। সে অবকাঠামো এলাকা ভিত্তিক হলে তার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট এলাকার নেতৃত্বের কাছে থাকবে। কিন্তু কেন্দ্রীয়ভাবে কিছু অবকাঠামো প্রয়োজন হলে তার ব্যবস্থা রাষ্ট্রনেতার সরকার করবে। কিন্তু লক্ষ্য হবে কেন্দ্রে যতদূর সম্ভব কম দায়িত্ব রাখা। আইন শৃংখলা ঠিক রাখার ব্যবস্থাও নেবে এলাকার জনগণ, তাদের এলাকার নেতৃত্বের মাধ্যমে। এলাকার স্থানীয় সেবা ব্যবস্থায় থাকবে পুলিশ, ডাক্তার, ম্যাজিস্ট্রেট, বিচারক – সবকিছু। তাদের বেতনও আসবে এলাকার জনগণের থেকেই।

তবে এসব ব্যবস্থা চালু করতে গেলে অনেক বিষয় এসে যাবে, যা একসঙ্গে না করলে হিতে বিপরীত হতে পারে। তাই সব স্তরে পরিবর্তন একবারে না এনে, প্রথমে কোবল রাষ্ট্রনেতা ও ন্যায়পালের ব্যবস্থায় নতুন পদ্ধতি চালু করা হোক। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে সবক্ষেত্রে পরিবর্তন আনতে চেষ্টা করা যেতে পারে।

৭। তথ্য প্রবাহে স্বচ্ছতা, বিশেষ সিদ্ধান্তে জনগণের সরাসরি মতামতঃ

কেবল বিশেষ নিরাপত্তাজনিত ও স্পর্শকাতর বিষয়গুলি ছাড়া বাকী সব সরকারী আলোচনা-পর্যালোচনা-সিদ্ধান্ত ইন্টারনেটের মাধ্যমে জনগণের জন্য প্রকাশ করতে হবে। শুরু থেকেই জিনিসগুলো প্রকাশ করতে হবে, সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেলে নয়। তাহলে জনগণও এ বিষয়গুলিতে তাদের মতামত দিতে পারবে, এবং বলতে গেলে এটিই হবে প্রকৃত গণতন্ত্র। বিশেষ করে বিদেশী যে কোন বিনিয়োগ, বা বিদেশীদের সঙ্গে যে কোন আলোচনা, চুক্তি, এগুলোও শুরু থেকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে জনগণকে জানাতে হবে।

রাষ্ট্রনেতার যোগ্যতার শর্তাবলী

প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে রাষ্ট্রনেতা হতে পারে এরকম কিছু সংখ্যক ব্যক্তিকে প্রাথমিকভাবে বেছে নেয়া হবে, যাদের মধ্য থেকে একজনকে বাছাই করা হবে নতুন উদ্ভাবিত প্রক্রিয়ায়। এই প্রাথমিক বাছাইএর জন্য কিছু শর্তাবলী দরকার, যা নিয়ে এখন আলোচনা করছি।

১। পেশাদারী নেতৃত্ব ও জনগণের সম্পৃক্ততাঃ

পেশাদারী নেতৃত্বের ব্যাপারটিই নতুন প্রস্তাবিত পদ্ধতির মূল। অভিজ্ঞতায় দেখেছি একটি দরিদ্র পরিবারের অনেক সন্তানের মধ্যে যার মেধা ভাল, স্কুলে ভাল ফলাফল করে, তাকে উচ্চ শিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য পরিবারের অন্য সবাই ত্যাগ স্বীকার করে। নিজেরা কম খেয়ে, কম পরে তাকে উচ্চ শিক্ষিত হওয়ার সুযোগ করে দেয়। বড় হয়ে এ সন্তানটি গোটা পরিবারকেই টেনে উপরে তোলার চেষ্টা করে, এবং বেশীরভাগ ক্ষেত্রে সফলও হয়। তেমনি জাতিগত ভাবেও আমরা স্কুলে কলেজে ফলাফলের ভিত্তিতে দেশের সীমিত সংখ্যক ব্যক্তিকে বিভিন্ন ধারায় উচ্চ শিক্ষিত হবার সুযোগ করে দিই যেন সে নানান পেশায় নিয়োজিত হয়ে দেশকে এগিয়ে নিতে পারে। এদের মধ্যে আবার অল্প কিছু সংখ্যক ব্যক্তি নিজস্ব প্রচেষ্টা ও উদ্যোগের ফলে তাদের মেধা ও যোগ্যতাকে উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়। ফলে তারা স্বাভাবিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন পেশায় সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছুতে পেরে যার যার কর্মক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিতে পারে। বস্তুতঃ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এদের নেতৃত্বের সম্মিলিত ফলেই দেশ সামগ্রিকভাবে এগিয়ে চলছে।

আমার প্রস্তাবের মূল ধারণাটি হচ্ছে যে নিজ উদ্যোগে ধাপে ধাপে সফলতার সঙ্গে অভিজ্ঞতা অর্জন করে ও যোগ্যতা দেখিয়ে যারা এ ধরনের পেশাগত নেতৃত্বের পর্যায়ে পৌঁছেছেন, পরবর্তী বড় ধাপে, অর্থাৎ রাষ্ট্র যন্ত্রে নেতৃত্ব দেবার জন্য এদের মধ্য থেকেই নেতা খুঁজে বের করতে হবে। আর এটিই তো স্বাভাবিক পদ্ধতি হবার কথা ছিল। এ ধরনের পেশাগত নেতৃত্ব দেয়ার কোন অভিজ্ঞতা যার নেই সে সারা দেশকে নেতৃত্ব দেবে কি ভাবে? কেন আমরা সে ধরনের একটি সরকার ব্যবস্থাকে মেনে নিয়েছিলাম, ভাবতে অবাক লাগে।

প্রচলিত দলভিত্তিক নির্বাচনের মাধ্যমে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদেরকে নেতৃত্বের আসনে বসানোর কারণেই আমরা দেশকে ব্যর্থতার দিকেই এগিয়ে যেতে দেখেছি দুঃখজনকভাবে যুগে যুগে, যদিও দেশে নেতৃত্ব দেবার মত যোগ্য ও আস্থাভাজন ব্যক্তি অনেক ছিলেন এবং এখনও আছেন। এ ধরনের যোগ্য মানুষের হাতে নেতৃত্ব এলে দেশের অবস্থা অল্প সময়েই উন্নতির দিকে নেয়া সম্ভব। কয়েকটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের খুবই স্বল্প সময়ের অভিজ্ঞতায় আমরা তার ইঙ্গিতও পেয়েছি।

তাই আমার প্রস্তাবের মূলেই রয়েছে দেশের সর্বোচ্চ স্তরে বিভিন্ন পেশাদারী ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেবার অভিজ্ঞতা যাদের রয়েছে তাদের মধ্য থেকেই একজন রাষ্ট্রনেতাকে বেছে নেয়া। এ পদ্ধতিতে অন্য যে কোন ব্যবস্থা থেকে যোগ্যতর ব্যক্তিকে আমরা রাষ্ট্রনেতা হিসেবে পাবার আশা করতে পারি।

কেউ যদি বলেন যে এ পদ্ধতিতে জনগণের সম্পৃক্ততা নেই তাহলে ভুল বলা হবে। আগে আলোচনা করা হয়েছে, ছাত্র ও পেশাদারী জীবনে বিভিন্ন গণ-মূল্যায়নের ভিত্তিতে তাদের বাছাই করা হয়েছে, তাই জনগণের সম্পৃক্ততা তাদের প্রাথমিক বাছাই প্রক্রিয়ায় রয়েই গেছে। কেউ যদি বলেন যে জনগণের সঙ্গে এদের সম্পর্ক কম, জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার কথা এরা জানেন না। এর উত্তরে আমি বলব যে দেশের কৃষক, শ্রমিক, চাকুরীজীবী, ব্যবসায়ী, সবারকমের পরিবার থেকেই এরা বড় হয়ে এসেছে, তাই জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা এরা বুঝবে না এ কথাটি ঠিক নয়। কেউ যদি বলেন যে এরা দেশপ্রেমিক নয়, এরা স্বার্থপর, ক্ষমতায় গিয়ে নিজের আখের গোছানোতেই ব্যস্ত থাকবে, তার উত্তরে প্রথমেই জিজ্ঞেস করব তারা কি বলতে চাচ্ছেন যে রাজনীতিবিদেরা বেশী দেশপ্রেমিক, বা বেশী নিস্বার্থ? আমার মনে হয় বাংলাদেশের মানুষকে এ কথার উত্তর দিয়ে বোঝানোর দরকার হবে না। সামগ্রিকভাবে রাজনীতিবিদদেরকে আমরা দেখেছি, আর স্বল্প সময়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নেতৃত্বও আমরা দেখেছি (অবশ্য রাজনীতির কু-চক্রের আওতায় গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া)। সারা জীবন ধরে একজন আদর্শ মানুষ হবার নীতি মেনে চলে বিভিন্ন পেশার শিখরে যারা পৌঁছান তারা দেশপ্রেমিক নন, তারা স্বার্থপর, এ কথাটি আমি গ্রহণ করতে পারছি না। সারা জীবনের চেষ্টায় নিজেকে সং রেখেছেন, ন্যায়নীতি মেনে চলে বিচার করেছেন, নেতৃত্ব দিয়েছেন, একটি সং-ভাবমূর্তির অধিকারী হয়েছেন, এ ধরনের ব্যক্তিদেরকে আদর্শ থেকে বিচ্যুত করা হয়ত অসম্ভব নয়, কিন্তু অন্য যে কারও তুলনায় তা অনেকাংশে কঠিন এবং সময়সাপেক্ষ। বরঞ্চ বিশাল পরিমাণ অর্থব্যয়ে ভোটযুদ্ধে জিতে আসা একজন রাজনীতিবিদের পদচ্যুতির সম্ভাবনা অনেক বেশী, যার চরম মূল্য দিচ্ছে আজ সারা বাংলাদেশের মানুষ। হ্যাঁ, বর্তমানের দলীয় রাজনীতির কারণে কিছু কিছু পেশায় তুলনামূলক কম যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিও শীর্ষে চলে গেছে। কিন্তু দলীয় রাজনীতি থেকে সরে এসে প্রস্তাবিত নতুন ব্যবস্থায় আস্থাভাজন ও যোগ্য ব্যক্তি-নেতৃত্বে আসতে থাকলে ধীরে ধীরে এ অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থা চলে যাবে।

২। শিক্ষাঃ

রাষ্ট্রনেতা হিসেবে বাছাই করার জন্য উপরে আলোচিত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের শিক্ষাকেও যোগ্যতার মাপকাঠি হিসেবে আমি ধরতে চাই। যেহেতু আধুনিক রাষ্ট্রকে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে তাল মিলিয়ে চলতে হবে, আধুনিক প্রকৌশল ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেশকে উন্নত করতে হবে, তাই ন্যূনতম শিক্ষার একটি মানদণ্ড থাকা প্রয়োজন, এবং আমি প্রস্তাব করছি যে তা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক বা গ্র্যাজুয়েশনের সমতুল্য হতে হবে। অবশ্য যে যোগ্যতাসম্পন্ন নেতৃত্বের কথা উপরে আলোচনা করেছি, তাতে উল্লিখিত শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিরাই স্বাভাবিকভাবে বাছাই হয়ে আসবে মনে করি।

৩। বয়সঃ

বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা, যা বয়সের সঙ্গে বাড়ে, তার প্রয়োজনও রাষ্ট্রনেতৃত্বে অনেক বেশী। যোগ্যতাসম্পন্ন একজন ব্যক্তির সারাজীবনের অভিজ্ঞতা এক ধরনের অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদৃষ্টি খুলে দেয়। কোন একটি নতুন প্রস্তাবনা বা পরিকল্পনা সামনে এলে এর ফলাফল কি হতে পারে, কি কি সমস্যা হতে পারে, তার বেশ কিছুটা তিনি মুহূর্তেই ধরে ফেলতে পারেন। পক্ষান্তরে একজন তীক্ষ্ণ মেধাবী কিন্তু বয়সে তরুণ ব্যক্তির পক্ষে

তা বোঝা সম্ভব হয় না। হয়ত একটি ভুল পরিকল্পনা নিয়ে বছরের পর বছর কাটিয়ে, হাজার হাজার কোটি টাকা খরচের পর, অনেক মানুষের জীবনের করুণ পরিণতির পর সে বুঝতে পারবে সেটি ভুল ছিল। আবার ৫ বছরের জন্য শারীরিক ও মানসিক যোগ্যতার কথা চিন্তা করে বেশী বয়সের দিকেও যাওয়া ঠিক নয়। তাই আমার প্রস্তাব হবে রাষ্ট্রনেতা হিসেবে যাকে বাছাই করা হবে, বাছাইর সময় তার বয়স হতে হবে ৬০ থেকে ৭০ বছরের মধ্যে।

৪। সততা ও অপরাধমুক্ত রেকর্ড :

এটি একটি অবশ্য পালনীয় শর্ত। পেশাদার জীবনে সততা ও অপরাধমুক্ত রেকর্ড না থাকলে কোন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রনেতা হিসেবে বাছাই এর প্রক্রিয়াতে ঢোকানোই যাবে না। আবার একবার এ প্রক্রিয়ার মধ্যে ঢুকে গেলেও কেউ নিশ্চিত হয়ে যেতে পারবেন না। পরবর্তীতেও যে কোন সময়ে কারও এরকম অপরাধ প্রমাণিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে তাকে নেতৃত্বের প্রক্রিয়া থেকে চিরজীবনের জন্য সরে যেতে হবে।

৫। শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতা:

এটিও স্বাভাবিকভাবেই একটি শর্ত হওয়া উচিত।

ন্যায়পালের যোগ্যতার শর্তাবলী

ন্যায়পালের জন্য রাষ্ট্রনেতার সব শর্তই প্রযোজ্য হবে কেবল বয়স ছাড়া। ন্যায়পালের বয়স হবে ৭০ বছর এর বেশী, তবে তাকে মানসিক ও শারীরিকভাবে সজাগ, কর্মক্ষম ও সুস্থ থাকতে হবে।

রাষ্ট্রনেতা ও ন্যায়পাল বাছাই ও অপসারণ প্রক্রিয়া:

মূল প্রস্তাবনা

রাষ্ট্রনেতা বাছাই:

রাষ্ট্রনেতার জন্য উপরের পাঁচটি নিরীক্ষায় সারা দেশের যে সব ব্যক্তি শর্ত পূরো করেন তাদের একটি তালিকা তৈরী করা হবে, বলা বাহুল্য, এ প্রথম তালিকায় তাদেরই নাম থাকবে যাদের বয়স ৬০ থেকে ৭০ এর মধ্যে, এবং এ তালিকার মধ্য থেকে একজনকে বাছাই করে নিতে হবে রাষ্ট্রনেতা হিসেবে।

ন্যায়পাল বাছাই:

পাশাপাশি একই পদ্ধতিতে ও একই শর্তে যাদের বয়স ৭০ বছরের বেশী, এবং উল্লিখিত ন্যায়পালের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলী যারা পূরণ করেন তাদেরও একটি তালিকা তৈরী করা হবে, যেটিকে আমরা দ্বিতীয় তালিকা বলছি। এ তালিকার মধ্য থেকে একজনকে বাছাই করে নিতে হবে ন্যায়পাল হিসেবে।

বাছাইকারী ও অপসারণকারী ব্যক্তিবর্গ:

১। জনগণের সাথে সম্পৃক্ততা

রাষ্ট্রনেতা ও ন্যায়পাল হিসেবে দুজন ব্যক্তিকে বাছাই করবার বা অপসারণ প্রক্রিয়ায় উল্লিখিত দুটি তালিকাভুক্ত ব্যক্তিবর্গই সম্পৃক্ত হবেন, যাদের আনুমানিক সংখ্যা হবে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কয়েক হাজার। তবে এ ক্ষেত্রে বয়সের নীচের সীমা ৫০ থেকে ধরা যেতে পারে। আগেই বলা হয়েছে এ তালিকাদুটির ব্যক্তিবর্গকে জনগণই বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থার মাধ্যমে বাছাই করে বিভিন্ন জাতীয় ক্ষেত্রে নেতৃত্বের আসনে বসিয়েছে। তাই তাদের মতামতের সঙ্গে জনগণের মতামতের একটি সম্পৃক্ততা স্বাভাবিকভাবেই তৈরী হয়ে আছে, এবং তারা

সম্মিলিতভাবে যে মতামত দেবেন তা জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষাকেই প্রতিফলিত করবে, জনগণের কল্যাণেই তা হবে।

২। ব্যক্তি বা গোষ্ঠীস্বার্থে সবাইকে প্রভাবান্বিত করার অবাস্তবতা

উক্ত দুটি তালিকাভুক্ত ব্যক্তিবর্গ তালিকাভুক্তির জন্য, কিংবা বাছাই বা অপসারণ প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত হবার জন্য রাষ্ট্র থেকে কোন ভাতা বা অনুদান পাবেন না। তারা যার যার পেশায় ছিলেন সেখানেই নিয়োজিত থাকবেন। উল্লিখিত বাছাই বা অপসারণ প্রক্রিয়ায় তারা অংশ গ্রহণ করবেন সম্পূর্ণ ঐচ্ছিকভাবে, এবং একটু পরেই আমরা দেখতে পাব যে মাঝে মাঝে একটি চিঠি পাঠাবার থেকে বেশী কোন খরচ তাদেরকে করতে হবে না। যেহেতু তারা তালিকাভুক্ত হওয়ার জন্য এবং বাছাই বা অপসারণ প্রক্রিয়ায় অংশ নেবার জন্য সরকারের সঙ্গে কোনভাবেই সম্পৃক্ত হবেন না বা নির্বাহী সরকারের কাছ থেকে কোন আর্থিক, ক্ষমতা বা অন্য কোন লাভ পাবেন না, তাই আশা করা যায় যে তাদের মূল্যায়ণ বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই নিস্বার্থ হবে এবং তা জনগণের কল্যাণেই হবে। তাছাড়া যে সব ব্যক্তিবর্গ তালিকাভুক্তিতে আসবেন, তাদের শর্তাবলী দেখেই বোঝা যাবে যে সারা জীবন ন্যায় ও নীতির উপর জীবনকে চালিয়ে যারা জীবনের এ পর্যায়ে চলে এসেছেন, ন্যায় ও নীতির উপর চলার একটি ভাবমূর্তি তৈরী করতে পেরেছেন, তাদেরকে সহজে কারও ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত হীন ও সংকীর্ণ স্বার্থে সহজে প্রভাবান্বিত করা যাবে না। তারপরও একজন দুজনকে কেউ প্রভাবান্বিত করতে পারলেও ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এ ধরনের কয়েক হাজার ব্যক্তিত্বের সবাইকে বা বেশীরভাগকে প্রভাবান্বিত করা বস্তুতঃ অসম্ভব এবং অবাস্তব।

৩। রাষ্ট্রনেতা ও ন্যায়পাল বাছাইকারী ও অপসারণকারী ব্যক্তিবর্গের তালিকা প্রণয়নঃ

উল্লিখিত এ তালিকাভুক্তি তৈরী এবং এবং বাছাই প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য একজন সিনিয়র সরকারী অফিসারের নেতৃত্বে একটি সরকারী বাছাই দপ্তর কাজ করবে। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির তত্ত্বাবধানে এ বিশেষ দপ্তরটি থাকতে পারে। দেশের বিভিন্ন পেশাদারী প্রতিষ্ঠান (সরকারী - সিভিল ও সামরিক, আধাসরকারী বা বেসরকারী, বড় স্কুল, বড় কলেজ, বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, বড় এনজিও, আইন-প্রতিষ্ঠান, ইত্যাদি, তবে সমিতি নয়) ও দপ্তরকে অনুরোধ করা হবে তাদের প্রতিষ্ঠান বা দপ্তরের অবসরপ্রাপ্ত বা কর্মরত যে সব ব্যক্তি উল্লিখিত শর্তাবলী পূরণ করেন তাদের নাম ঐ বাছাই দপ্তরে পাঠাতে। নাম পাঠানো পেশাদারী প্রতিষ্ঠানকে আমরা ‘মনোনয়নকারী প্রতিষ্ঠান’ বলব। কোন ব্যক্তি নিজের নাম পাঠাতে পারবে না। প্রবাসী বাংলাদেশীরা দেশ ও দেশের মানুষকে ভালভাবে জানার সুযোগ পান না বিধায় প্রবাসী কোন সংস্থা থেকে মনোনয়ন নেয়া হবে না। শর্তাবলী পূরণের ব্যাপারটি বাছাইকারী দপ্তরটি নিরীক্ষা করে দেখবে। তাদের বিচারে ঐ তালিকা থেকে কাউকে বাদ দিতে হলে, কারও ব্যাপারে সন্দেহ বা বিতর্ক থাকলে, বা কারও বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তি বা মহল থেকে অভিযোগ এলে গোপন তদন্তের মাধ্যমে সে ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করে যদি সে নামটি বাতিলযোগ্য মনে হয় তবে এসব তথ্যসমূহ উক্ত ব্যক্তির মনোনয়নকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে পাঠানো হবে। এরপরও মনোনয়নকারী প্রতিষ্ঠানের ভিন্নমত থাকলে সুপ্রিম কোর্টের কয়েকজন সিনিয়র বিচারপতির সমন্বয়ে গঠিত একটি বেঞ্চের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে, এবং সেটিই চূড়ান্ত হবে। তবে যে ব্যক্তির ব্যাপারে বিষয়টি বিবেচনায় আসবে তার সম্মান যেন কোনভাবে ক্ষুণ্ণ করা না হয় সে দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। তাকে না জানিয়ে বিষয়টি যতদূর সম্ভব গোপন রাখতে হবে।

চূড়ান্তভাবে তালিকাভুক্ত ব্যক্তিদের কাছে চিঠি দিয়ে এ অন্তর্ভুক্তির কথা জানানো হবে। যাদের নাম তালিকাভুক্ত হয়ে গেছে তারা অপর যে কোন ব্যক্তির নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য সুপারিশ করতে পারবেন, এবং সে ব্যক্তির রেকর্ডও উল্লিখিত পদ্ধতিতে নিরীক্ষা করা হবে। কেউ যদি তালিকা থেকে নিজের নাম সরিয়ে ফেলতে চান, তার সুযোগ থাকবে। আশা করা যায় এ পদ্ধতিতে তৈরী তালিকাভুক্তি বাংলাদেশে কয়েক হাজার ব্যক্তির মধ্যে সীমিত থাকবে, ফলে রাষ্ট্রনেতা ও ন্যায়পাল বাছাইর কাজটি অনেক সহজ হয়ে যাবে। প্রচলিত নির্বাচনের মত বিশাল অর্থ খরচের প্রয়োজনও হবে না। এ তালিকাভুক্তি প্রতি বছর নবায়ণ করতে হবে। এতে একই

পদ্ধতিতে নতুন নাম সংযোজন করা হবে, আবার প্রথম তালিকার যারা ৭০ বছর বয়স পার হয়েছেন তাদের নাম স্বয়ংক্রিয়ভাবে দ্বিতীয় তালিকায় যোগ হবে। মৃত্যুর কারণে বা মানসিক ও শারীরিক অক্ষমতার কারণেও কিছু নাম বাদ যাবে।

রাষ্ট্রনেতা হিসেবে একজনকে বেছে নেয়া

উল্লিখিত তালিকা দুটির প্রতিটি ব্যক্তির কাছ থেকে বিশদ বায়োডাটা, পেশাদারী ও অন্যান্য ক্ষেত্রে তার অবদান সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করে বাছাই দপ্তরে কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা হবে। এরপর সবার উপর সংক্ষিপ্তসার তৈরী করে বই আকারে তালিকাভুক্ত সবার কাছে পাঠানো হবে এবং তাদেরকে অনুরোধ জানানো হবে প্রথম তালিকা থেকে (৬০ থেকে ৭০ বছর বয়স) নিজের নাম বাদ দিয়ে সর্বোচ্চ পাঁচ জনের নাম একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাঠাতে, যাদেরকে তিনি রাষ্ট্রনেতা হিসেবে মনোনীত করতে চান। ঐ তারিখের মধ্যে সবার কাছ থেকে যে নামগুলো পাওয়া যাবে তা কম্পিউটারের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে মনোনয়নের সংখ্যা হিসেবে ক্রমধারায় সাজানো হবে। সবচেয়ে বেশী মনোনয়ন যিনি পাবেন তার কাছে বাছাই দপ্তর এর সিনিয়র অফিসারদের একটি দল অনুরোধ নিয়ে যাবে। তাঁকে জানানো হবে যে দেশের সব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির তাঁর উপর আস্থা রেখেছে এবং তাঁকে রাষ্ট্রনেতা হিসেবে দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করছে। তিনি রাজী না হতে চাইলে সম্মানের সঙ্গে তাঁকে আবারও অনুরোধ জানানো হবে। নিতান্ত অপারগ হলে মনোনয়ন ক্রমধারায় পরবর্তী ব্যক্তিকে একইভাবে অনুরোধ করা হবে, এবং তিনিও অপারগতা প্রকাশ করলে এ ভাবে ক্রমধারা অনুসরণ করে অনুরোধ যেতে থাকবে। আশা করা যায় এঁদের মধ্যে কেউ না কেউ রাজী হয়ে যাবেন, এবং তিনিই হবেন পরবর্তী ৫ বছরের জন্য দেশের রাষ্ট্রনেতা। রাষ্ট্রনেতার সরকারের শুরু যখন থেকেই হোক না কেন, তখন থেকেই ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য তিনি নিযুক্ত হবেন।

কখনও রাষ্ট্রনেতার অপসারণ হলে, বা মৃত্যু ঘটলে ঠিক একই পদ্ধতিতে আর একজনকে রাষ্ট্রনেতা নিয়োগ করা হবে। যেহেতু এখানে কেউ নিজে থেকে রাষ্ট্রনেতা হবার জন্য দাঁড়াচ্ছেন না, অতএব, একই ব্যক্তি কবার রাষ্ট্রনেতা হতে পারেন তার কোন বিধান রাখার প্রয়োজন নেই। বয়সের সীমার শর্ত পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে এক ব্যক্তি দুবারের বেশী এমনিতেই রাষ্ট্রনেতা হতে পারছেন না।

ন্যায়পাল বাছাই প্রক্রিয়া

উপরের যে পদ্ধতিতে রাষ্ট্রনেতা বাছাই করা হল, একই পদ্ধতিতে ও একই শর্তে দ্বিতীয় তালিকা থেকে (৭০ বছরের বেশী বয়স) একজন ন্যায়পাল বাছাই করা হবে, যিনি পরবর্তী ৫ বছরের জন্য ন্যায়পাল হিসেবে নিয়োগ পাবেন।

রাষ্ট্রনেতার অপসারণ প্রক্রিয়া

১। রাষ্ট্রনেতা ও ন্যায়পাল বাছাইর জন্য যে তালিকা দুটি তৈরী করা থাকবে তার প্রতিজনের কাছ থেকে (কিন্তু রাষ্ট্রনেতা, ন্যায়পাল ও মন্ত্রীরা ছাড়া) প্রতি তিন মাস পর পর একটি প্রশ্নের লিখিত উত্তর চাওয়া হবে। সেটি হল, “আপনি কি মনে করেন, বর্তমান রাষ্ট্রনেতার সরকার ব্যর্থ হয়েছে এবং তাকে ও তার সরকারকে সরে যেতে হবে?” পাওয়া উত্তরগুলোর ৫০% এর বেশী যদি হ্যাঁ-সূচক হয় তবে চলতি সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি তখন ন্যায়পালকে বিষয়টি জানাবেন, এবং ন্যায়পাল রাষ্ট্রনেতাকে খবরটি জানাবেন। অনতিবিলম্বে নতুন একজন রাষ্ট্রনেতা নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করবার জন্য নির্ধারিত দপ্তরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি। নতুন রাষ্ট্রনেতা বাছাই হলে এবং তার মন্ত্রীপরিষদ বা সরকার গঠিত হয়ে গেলে বিদায়ী রাষ্ট্রনেতা ও তার মন্ত্রীপরিষদ নতুনদের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করে দেবেন।

বাছাইকারী তালিকা দুটি তৈরী থাকার কারণে কাজটি এবার সহজ হবে এবং এক মাসের মধ্যে নতুন রাষ্ট্রনেতা বাছাই করা শেষ করে পুরোনো রাষ্ট্রনেতা ও তার সরকারের কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নিতে হবে। পুরোনো রাষ্ট্রনেতা ও তার সরকারের প্রতি উপযুক্ত সম্মান দেখিয়ে যেন সরকার বদল হয় তা নিশ্চিত করবেন ন্যায়পাল ও নতুন রাষ্ট্রনেতা।

ন্যায়পাল অপসারণ প্রক্রিয়া

১। রাষ্ট্রনেতা ও ন্যায়পাল বাছাইর জন্য তৈরী তালিকা দুটির প্রতিজনের কাছ থেকে প্রতি তিন মাস পর পর যে উত্তরপত্র সংগ্রহ করা হবে তাতে আর একটি প্রশ্ন থাকবে, “আপনি কি মনে করেন ন্যায়পালের সরে যাওয়া উচিত?”। যদি উত্তরদাতাদের ৫০% এর বেশীর উত্তর হ্যাঁ হয় তবে তা সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ন্যায়পালকে জানাবেন এবং নতুন ন্যায়পাল বাছাই করার প্রক্রিয়া শুরু করবেন। এক মাসের মধ্যে এ প্রক্রিয়াটি শেষ করতে হবে। নতুন ন্যায়পাল বাছাই হয়ে গেলে তাঁকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে পুরোনো ন্যায়পাল সরে যাবেন। গোটা পদ্ধতিটিও হতে হবে পুরোনো ন্যায়পালের সম্মান রক্ষার ভিতর দিয়ে, এবং এর জন্য দায়িত্ব থাকবে বিদায়ী ন্যায়পাল ও সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে।

জরুরী ভিত্তিতে অপসারণ

যদি কখনও মনে হয় যে এমন জরুরী অবস্থা হয়ে গেছে যে তিন মাস বিরতির আগেই রাষ্ট্রনেতাকে অপসারণ করা জরুরী, সে ক্ষেত্রে ন্যায়পাল, বা উক্ত তালিকাদুটির থেকে যে কোন ব্যক্তি, বা সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি যদি উদ্যোগ নেন যে সে মুহূর্তেই একটি অপসারণ প্রক্রিয়া শুরু করা জরুরী, তাহলে জরুরী ভিত্তিতে তালিকাভুক্ত সবার কাছ থেকে আগের বর্ণনা অনুযায়ী মতামত আনার জন্য ব্যবস্থা নেবে এ প্রক্রিয়ায় সহায়তাকারী সরকারী সংস্থা।

একইভাবে ন্যায়পালকে পরিবর্তন করার জরুরী প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে সে ক্ষেত্রে উক্ত তালিকাদুটির থেকে যে কোন ব্যক্তি, বা সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি উদ্যোগ নিলে তখনই একটি অপসারণ প্রক্রিয়া শুরু করা হবে। এ জন্য জরুরী ভিত্তিতে তালিকাভুক্ত সবার কাছ থেকে আগের বর্ণনা অনুযায়ী মতামত আনার জন্য ব্যবস্থা নেবে এ প্রক্রিয়ায় সহায়তাকারী সরকারী সংস্থা।

মতামত আসার পর উপরিলিখিত উপায়ে দায়িত্ব হস্তান্তর করা হবে। এ ক্ষেত্রে তা এক সপ্তাহের মধ্যেও করা সম্ভব, যদি তালিকাভুক্ত ব্যক্তিদের সবার কাছে ইন্টারনেটের ব্যবস্থা দেয়া যায়।

ন্যায়পালের দায়িত্ব

রাষ্ট্রনেতার ভুল ধরানো ও পরামর্শ প্রদানঃ

ন্যায়পালের নেতৃত্বে একটি দপ্তর কাজ করবে। ন্যায়পালের দপ্তরের দায়িত্ব ও কর্মপরিকল্পনার ধারণা নীচে আলোচনা করা হল।

১। যে কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রনেতার বা তার সরকারের কার্যক্রমের যে কোন ব্যাপারে প্রশংসা বা অভিযোগ ন্যায়পালের দপ্তরে পেশ করতে পারবেন।

২। দেশের পত্রিকাগুলো সরকারের কার্যক্রমের প্রশংসা ও অভিযোগ সূচক খবরগুলো যতদূর সম্ভব অনুসন্ধান ও তথ্যের ভিত্তিতে প্রকাশ করে প্রয়োজনীয় সমালোচনা জানাতে পারবে।

৩। প্রধান প্রধান জাতীয় দৈনিক ও স্থানীয় দৈনিক পত্রিকা থেকে সরকারের কার্যক্রমের প্রশংসা ও অভিযোগ সূচক খবরগুলো ন্যায়পালের দপ্তরের নিজের উদ্যোগে সংগ্রহ করা হবে ও তার যথার্থতা অনুসন্ধান করে যাচাই করা হবে।

৪। এর বাইরেও যে কোন ভাবে তথ্য সংগ্রহ করবে ন্যায়পালের দপ্তর।

৫। এ সব তথ্যের ভিত্তিতে ন্যায়পাল যে কোন সময়ে রাষ্ট্রনেতাকে উপদেশ ও পরামর্শ দেবেন তার সরকারের কর্মকান্ড সম্পর্কে। সঠিক কাজের প্রশংসা জানাবেন, তেমন ভুলগুলোও ধরিয়ে দেবেন হৃদয়তাপূর্ণ পরিবেশে, রাষ্ট্রনেতা ও তার সরকারের সম্মান রেখে।

গ) নতুন প্রস্তাবনার বিভিন্ন দিক

যে কোন নতুন প্রস্তাবনায় স্বাভাবিক ভাবেই অনেক অসম্পূর্ণতা ও ফাঁক ফোকর থাকবে। আমরা যদি প্রাথমিকভাবে মনে করি যে এ ধারণার ভিত্তিতে একটি উন্নত রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যবস্থা করা যেতে পারে তবে সবাই মিলে মাথা খাটিয়ে (ব্রেইনস্টর্মিং) করে এর দুর্বলতাগুলোকে শুধরিয়ে নিতে পারব।

তা ছাড়া নতুন প্রস্তাবে আরও থাকবে কি ভাবে রাষ্ট্রনেতার সুযোগ্য নেতৃত্বে জনগণ নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য গড়ে তুলবে। তথাকথিত ‘গণতন্ত্রের’ নামে জনগণের সমস্ত ক্ষমতা ও অর্থকে কেড়ে নিয়ে কিছু মানুষের হাতে কুক্ষিগত করে নয়। ভোটের মাধ্যমে জনগণের ইচ্ছা অনিচ্ছার প্রতিনিধিত্ব করার কথা বলে নিজের সমস্ত ইচ্ছা অনিচ্ছা জনগণের উপর চাপিয়ে দিয়ে নয়।

নতুন প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় জনগণের সম্পদ জনগণের কাছেই থাকবে। কিভাবে তারা ছোট ছোট সমাজ ব্যবস্থার মাধ্যমে তার উপযুক্ত ব্যবহার করে জনগণের কল্যাণ করতে পারবে, সম্পদ বৃদ্ধি করতে পারবে, আর এসব ছোট ছোট সমাজের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করে বৃহত্তর দেশের সামগ্রিক উন্নতি করা যাবে তার জন্য প্রয়োজনীয় নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনা রাষ্ট্রনেতা করবেন, কিন্তু তা হবে দেশের চিন্তাবিদ, ন্যায়পরায়ণ ও যোগ্য ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করে। এবং সবকিছুই (নিরাপত্তাজনিত স্পর্শকাতর বিষয়গুলি ছাড়া) পত্রপত্রিকার ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে জনগণকে জানাতে হবে, তাহলে জনগণের মতামত জানারও একটি সুযোগ থাকবে, যা আগে বলা হয়েছে।

কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে জনগণ এতদিন যে ভোট দেয়ার অধিকার পাচ্ছিল, সেটি তো আর থাকছে না। এর উত্তরে যদি বলি যে এটি একটি সূক্ষ্ম প্রতারণার কৌশল, ভোটের অধিকারের কথার একটি মোহ তৈরী করে বাঁচার অধিকার কেড়ে নেয়া হচ্ছে, তাহলে কি খুব ভুল বলা হবে? কারণ ভোট দেয়ার কয়েক সেকেন্ড সময়ের জন্যই জনগণ নিজস্ব অধিকার পাচ্ছে। তার আগে পরের পুরো সময়ই কিন্তু সে থাকছে বস্তুতপক্ষে ‘প্রজা’। বরঞ্চ নাটোরের সেই ‘লাঠি-বাঁশী সমিতির’ মত করে জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণে আমরা যদি স্থানীয় সরকার থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় সরকার পর্যন্ত, পুলিশ, বিচার ব্যবস্থা সবকিছু গঠন করি, তাহলেই মনে হয় সত্যিকারের ‘গণতন্ত্রের’ আশ্বাদ আমরা পেতে পারব।

বর্তমানের তথাকথিত ‘গণতন্ত্রে’ বড় বড় কেনাকাটায় জনগণের সমস্ত সম্পদ নিয়োগে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা ব্যস্ত, কারণ সেখানে পকেটে বড়সর কিছু উচ্ছিষ্ট আসার সম্ভাবনা আছে। তাই কৃষকের ক্ষেতে সার সরবরাহ দেয়া হচ্ছে কিনা, তার সেচের মোটরের জন্য বিদ্যুৎ আছে কিনা এ ব্যাপারে প্রতিনিধিদের সময় হয় না। অভিযোগ করলে গুলি খেয়ে মরতে হচ্ছে কৃষককে। দিনাজপুরের কন্যাকে আইন রক্ষাকারী বাহিনীর মানুষ ধর্ষণ করে হত্যা করেছে, সে খবরটি ঢাকায় বসবাসকারী জনগণের প্রতিনিধি বা নতুন ‘রাজাদের’ কানে তুলতে সাতজন মানুষকে গুলি খেয়ে মরতে হয়েছে। নদীতে বসতবাড়ী ভেঙ্গে ফেলেছে, ভোট দেয়া প্রতিনিধির বহু ‘বড় বড় প্রয়োজনের’ কাছে এ গুলো নিতান্তই তুচ্ছ। নিজেই খুঁজে খুঁজে একটুখানি মাথা গাঁজার জায়গা করেছে শহরের বস্তিতে। বিন্দু বিন্দু করে সঞ্চয় করেছে সামান্য কিছু অর্থ, কিছু জিনিসপত্র, ভবিষ্যতের

আশায়। হঠাৎ করে তার ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই এসে সেই বস্তি গুঁড়িয়ে দিয়ে তার নতুন করে বাঁচার চেষ্টাকেও মিলিয়ে দিচ্ছে, কারণ বস্তি নব্য রাজাদের শহরের সৌন্দর্য নষ্ট করছে। রবি ঠাকুরের সেই ‘সামান্য ক্ষতি’র চিত্রই যেন ঘুরে ঘুরে আসছে শুধু।

যাদেরকে সে ভোট দিয়েছিল, সেই প্রতিনিধিই বলবে যে তাকে মেরে ফেলবার ম্যান্ডেট ভোটের মাধ্যমে সেই তাদেরকে দিয়ে দিয়েছে। জনগণের পক্ষ হয়ে সব চিন্তা ভাবনা করার, সিদ্ধান্ত নেবার ‘পাওয়ার অফ অ্যাটর্নী’ প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের হাতে ন্যস্ত হয়ে গেছে ভোটের মাধ্যমে, এখন জনগণের নিজের চিন্তা ভাবনা করার, বাঁচার চেষ্টা করার কিছুই নেই। সরকার চাইলে সে বাঁচবে, সরকার চাইলে সে মরবে। তার হাতে আর কিছু নেই, আবার পাঁচ বছর পরে ভোটের ব্যালট কাগজে আবার একটি সিল দেয়া ছাড়া। তাই পাঠককে আবারও চিন্তা করতে বলছি ভোটের অধিকার, না নিজেদের ভাগ্য গঠনে নিজেদের অধিকার পাওয়ার অধিকার কোনটি বড় ?

প্রশ্ন করতে পারেন যে প্রস্তাবিত নতুন ব্যবস্থায় কি একই রকম হতে পারে না? এর উত্তর হবে যে প্রাথমিক পর্যায়ে কিছুটা হতে পারে, কিন্তু দিন দিন অবস্থার উন্নতি হবার আশা করতে পারি, কারণ এ ব্যবস্থায় তুলনামূলকভাবে যোগ্যতর ব্যক্তিবর্গের হাতে দেশ পরিচালনার ভার আসছে। তারা দেশ না চালালেও, বড় বড় প্রতিষ্ঠান পরিচালনার অভিজ্ঞতা নিয়ে এসেছেন। অথচ আগের ব্যবস্থায় ভোটে জিতে আসা সাংসদ বা মন্ত্রীদের বেশীরভাগেরই এর বিন্দুমাত্রও ছিল না। অবস্থা থেকে শিখে তাড়াতাড়ি সমাধান খুঁজে বের করবার অভিজ্ঞতা নতুন ব্যবস্থার নেতৃত্বে থাকা ব্যক্তিদের আছে। তাছাড়া দায়িত্ব পালনের পরদিন থেকেই ভোটে খরচ করা হাজার কোটি টাকা ওঠাবার চিন্তাও তাদের করতে হবে না।

প্রচলিত ভোট ভিত্তিক ‘গণতন্ত্রে’ নিজের গ্রামে বা এলাকার প্রশাসন ব্যবস্থায়ও জনগণের করণীয় কিছু নেই। ‘রাজধানী’ থেকে আসা ‘রাজার’ প্রতিনিধিদের হাতে সব ক্ষমতা। তারা যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। প্রস্তাবিত নতুন ব্যবস্থায় প্রতিটি এলাকার প্রশাসন, পুলিশ, বিচার ব্যবস্থা এলাকার মানুষের হাতেই থাকবে, বাইরে থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসা ব্যক্তিদের হাতে নয়। নাটোরের লাঠি বাঁশী সমিতির কথা আগে বলেছি। এ মডেলটি নিয়ে অনেক চিন্তা ভাবনা করার দরকার আছে। পুলিশ বাহিনীর পিছনে সরকারের বিশাল খরচ ছাড়াই এ সমিতি নাটোরকে অপরাধমুক্ত রেখেছিল অনেক দিন। এতে সৎ পুলিশ কর্মচারীরা কিন্তু খুশীই হয়েছিলেন। অন্যান্য জায়গায়ও এ মডেলটি পরীক্ষা করে দেখা যায় কিন চিন্তাভাবনা করছিলেন। কিন্তু এতে দুর্নীতিবাজ পুলিশ কর্মচারীর পকেটে পয়সা আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দলীয় রাজনৈতিক নেতাদের ক্যাডার বাহিনীর চাঁদাবাজী বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাই এ ব্যবস্থা চলতে দেয়া সম্ভব হয় নি। সংবিধানের উদ্ধৃতি দিয়ে সফল লাঠি-বাঁশী সমিতিতে চলতে দেয়া হল না।

পুলিশ বাহিনীর কথা যদি আসে, তবে বলতে হয়, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রশাসনের জন্য সে ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল। আগেকার রাজাদের কোতোয়াল, আর ব্রিটিশদের লাল-পাগড়ী জনগণের সেবার জন্য তৈরী হয় নি, তৈরী হয়েছিল রাজার স্বার্থ দেখার জন্য। নতুন ব্যবস্থায় আমরা ‘রাজা’ নামের জায়গায় একজন নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীকে কেবল বসিয়ে দিয়েছি। তাই এ ব্যবস্থার পুলিশ তো জনগণের জন্য হতে পারে না। সে কাজ করবে নব্য রাজাদের বা তথাকথিত জন-প্রতিনিধিদের ব্যক্তি স্বার্থে।

শুধু পুলিশ কেন, সব ক্ষেত্রেই আমরা ঔপনিবেশিক ‘টপ-ডাউন’ বা ক্ষমতার নিম্নমুখী ব্যবস্থা চালু রেখেছি। যে জনগণকে একজন সিভিল সারভেন্ট সেবা দিচ্ছেন, তার কাজের মূল্যায়ণ বা গোপনীয় রিপোর্ট কিন্তু তার সেবাগ্রহণকারীরা দিচ্ছেন না, দিচ্ছে ঐ সার্ভিসে তার উপরওয়াল। তাই তিনি কাকে খুশী রাখতে চাইবেন, জনগণকে, না তার উপরওয়ালকে? প্রশাসন, বিচার ব্যবস্থা সব জায়গায় একই ব্যবস্থা। তাই বর্তমান ব্যবস্থাকে কোনভাবেই গণতন্ত্র বলা যেতে পারে না।

তবে এ ব্যবস্থাগুলো নিয়ে আরও অনেক চিন্তাভাবনা করার দরকার আছে, এবং সময় নিয়ে আস্তে আস্তে করা যাবে, যদি দেশের সর্বোচ্চ পর্যায়ে যোগ্য ও আন্তরিক নেতৃত্ব আগে আনা যায়। মূল বিষয়টি হচ্ছে, জনকল্যাণ আসতে পারে সুযোগ্য নেতৃত্ব থেকে, নির্বাচিত প্রতিনিধি থেকে নয়।

একটি উদাহরণ দেয়া যাক। ধরুন বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে একটি জাহাজ চলছে। বলা হল ভোটের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচন করে জাহাজ পরিচালনা করতে হবে। নির্বাচনে মেজরিটির ভোট পেয়ে একজন খালাসী দায়িত্ব পেয়ে গেল। সে কি জাহাজটিকে নেতৃত্ব দিয়ে সব জাহাজবাসীকে অভিশ্রু বন্দরে পৌঁছে দিতে পারবে? খুব সম্ভবতঃ, না, জাহাজটি ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনাই সেখানে বেশী। জাহাজ পরিচালনায় বিচক্ষণতা আছে, প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আছে এরকম একজনের হাতেই পরিচালনার ভার দিলে সবার জীবন বাঁচিয়ে জাহাজটিকে তীরে নেবার বেশী সম্ভাবনা। হয়ত শতভাগ গ্যারান্টি দিতে পারব না, কিন্তু সম্ভাবনা অনেক, অনেক বেশী।

আর একটি ব্যাপার আছে। ভোটের মাধ্যমে এভাবে সাংসদ নির্বাচন করলে দেখা যাবে যে যেহেতু এদের কারও তেমন অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতা নেই, তখন দেশের বা দেশের বাইরের স্বার্থপর কোন গোষ্ঠীর হাতে তারা পুতুল সরকার হয়ে যেতে পারে, চক্রান্তে পড়ে দেশের সম্পদ অন্যদের হাতে চলে যেতে পারে, সরকারের সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও। বরঞ্চ লেখাপড়া জানা, অভিজ্ঞতা সম্পন্ন যোগ্য ব্যক্তিদের হাতে দেশের নেতৃত্ব থাকলে সহজে এসব ভিনদেশী স্বার্থপর গোষ্ঠী তাদেরকে ঠকাতে পারবে না। এতে দেশের স্বার্থও বেশী রক্ষিত হবে। তাছাড়া আগে বলেছি প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় নিরাপত্তাজনিত কিছু বিষয় গোপন রাখা ছাড়া সব বিষয়, বিশেষ করে যে কোন বিদেশী বিনিয়োগ, বা বিদেশীদের সঙ্গে যে কোন চুক্তির বিষয়গুলি পত্রপত্রিকা ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রকাশ করে দিতে হবে, শুরু থেকেই, যেন জনগণের এ বিষয়ে মতামত দিতে পারে। এর ফলে জনগণও দেশ পরিচালনার বিষয়ে সরাসরিও অংশ গ্রহণ করতে পারবে। তাই ভোটের ব্যবস্থা সমান্য একটু অধিকার দিয়ে অন্য সব অধিকার কেড়ে নেয়ার একটি ফন্দি মাত্র।

একটি উদাহরণ দিচ্ছি। ধরুন দুটি সংগঠন আছে যারা অশিক্ষিত দরিদ্র মানুষদের জন্য কাজ করে। একটি সংগঠন প্রতিনিধিত্বমূলক পরিচালনা বোর্ড ব্যবস্থা গ্রহণ করল। সেখানে দশ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা বোর্ডে সংগঠনের উদ্যোক্তা একজন দুজন শিক্ষিত সদস্য ছাড়া বাকী সবাই অশিক্ষিত বা স্বল্প শিক্ষিত দরিদ্র সদস্য। গর্ব করে বলা যেতে পারে যে এ বোর্ডে সব সাধারণ সদস্যদের প্রতিনিধি বেশী আছে। অপর সংগঠনটি পরিচালনা বোর্ডে অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত দরিদ্র সদস্যদেরকে না রেখে সংগঠনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে যে সব শিক্ষিত ব্যক্তির নেতৃত্ব দিচ্ছে তাদেরকে নিয়ে পরিচালনা বোর্ড গঠন করল। এখন আপনিই চিন্তা করুন কোন প্রতিষ্ঠানটি সদস্যদের জন্য অধিক কল্যাণমুখী হবে?

প্রথম সংগঠনে দেখা যাবে শিক্ষিত একজন বা দু জন উদ্যোক্তা যা চিন্তা করছেন সেগুলিকেই বোর্ডের সভায় পাশ করিয়ে নিতে পারছেন। তাদের কথার মারপ্যাঁচের সামনে বাকী ৮/৯ জন অশিক্ষিত সদস্য কোন কূল-কিনারা করতে পারবে না। তাই ওই একজন বা দুজনের চিন্তাতেই পুরো সংগঠন চলবে। বলতে গেলে সংগঠনটি হয়ে উঠবে স্বৈরতান্ত্রিক। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় সংগঠনটির সব সদস্যই শিক্ষিত ও নেতৃত্বের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হওয়ায় পরিচালনা বোর্ডে তারা যে সব মতামত তুলে ধরবেন তাকে অবহেলা করতে পারবেন না একজন বা দুজন উদ্যোক্তা। কথার মারপ্যাঁচে সবাইকে ঠকানোও অনেক কঠিন হবে। তাই এটি হয়ে উঠবে সদস্যদের জন্য অনেক বেশী কল্যাণমূলক। হয়ত বলতে পারেন যে দশজন সবাই শিক্ষিত হওয়াতে তারা একত্রে মিলে দরিদ্রদেরকে বঞ্চিত করতে পারে। কিন্তু তা হতে হলে দশ জনকেই খারাপ হতে হবে, যা হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। আর তা ছাড়া বাংলাদেশের বাস্তবতায় তাদের অনেকেই হয়ত দরিদ্র বা মধ্যবিত্ত ঘর থেকেই এসেছেন, নিজেকে সবদিক দিয়ে উন্নত করে জীবন চালিয়েছেন। হঠাৎ করে তাকে খারাপ করে ফেলা একটু কঠিন বৈকি। এ ক্ষেত্রে দশজনের যোগ্য নেতার অভিজ্ঞতা সম্মিলিতভাবে সংগঠনকে সফলতার দিকে নিয়ে যেতে পারবে অনেক তাড়াতাড়ি। ফলে দ্বিতীয় সংগঠন অনেক বেশী সফল হবে এবং দরিদ্র সদস্যরা সত্যিকারে উপকৃত হবে।

উপরের উদারণ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের থেকে আস্থাভাজন যোগ্য ও অভিজ্ঞ নেতৃত্ব জনগণের স্বার্থের বেশী সহায়ক। প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে জনগণ সরাসরি তাদের অভিযোগ জানাতে পারবে পত্র পত্রিকা ও ন্যায়পালের মাধ্যমে। তা ছাড়া যে কয়েক হাজার যোগ্য ব্যক্তির তালিকা তৈরী হবে, যারা রাষ্ট্রনেতা ও ন্যায়পাল বাছাই করা ও অপসারণের দায়িত্বে থাকছেন, তাদের সবার একত্রে স্বার্থপর ও খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। এদের কাছ থেকে পাওয়া ত্রৈমাসিক বা অবস্থা বিশেষে জরুরী মূল্যায়নপত্র অনেক অপ্রিয় কাজকে সহজ করে দেবে, খুব অল্প সময়ে, অনেক অনেক কম খরচে। আগেই বলা হয়েছে যে এদের ৫০% এর বেশীর মতামত রাষ্ট্রনেতাকে বা ন্যায়পালকে সরে যেতে বাধ্য করবে। তাই একজন ব্যর্থ রাষ্ট্রনেতা বেশীদিন দায়িত্বের অবস্থানে থেকে যেতে পারবেন না। যদি প্রয়োজন হয় তবে চলতি সরকারকে পাল্টিয়ে নতুন একটি সরকার গঠন করা যেতে পারে মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে, যেহেতু এখানে ইন্টারনেট ও কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে। বর্তমান গণতন্ত্রে ক্ষমতাসীন দল ব্যর্থ হলেও প্রায় ৫ বছর দ্বিধা ক্ষমতা চালিয়ে যেতে পারছেন, হয়ত জনগণের বিরূপ ক্ষতি সাধন করে।

প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে কোন দল থাকবে না, ব্যক্তি স্বাধীনতা থাকবে। যে রাষ্ট্রনেতার কথা বলছি সে নিজে থেকে কখনোই নেতৃত্ব কামনা করবে না, জনগণ অনেকটা জোর করেই তাকে নেতৃত্বের আসনে বসাবে। রাষ্ট্রনেতার কোন দল থাকবেনা বিধায় তার ক্ষমতা ব্যক্তি হিসেবেই সীমিত থাকবে। তিনি যতক্ষণ যোগ্যতার সঙ্গে ভাল কাজ করবেন ততক্ষণ জনগণ তাকে সমর্থন দেবে। ভুল করলে তাকে পরামর্শ ও উপদেশ দেবার ব্যবস্থা থাকবে যেন তিনি সহজে সংশোধন করতে পারেন। কিন্তু যখন মনে হবে তিনি পারছেন না, তখনই তাকে সরিয়ে ফেলার সহজ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে।

প্রস্তাবিত ব্যবস্থাটি বহুল পরিচিত এবং নিশ্চিত একনায়কতন্ত্র বা স্বৈরতন্ত্র নয়, বা সেদিকে মোড় নিতেও পারবে না। কারণ একনায়কতন্ত্র বা স্বৈরতন্ত্রে পিছনে একটি বড় শক্তির প্রয়োজন হয়। সাধারণতঃ সামরিক শক্তি বা একটি বড় রাজনৈতিক দলের থেকে এ শক্তি আসে যা প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় সম্ভব নয়। রাষ্ট্রনেতা আসছেন সম্পূর্ণ ব্যক্তি যোগ্যতার উপর নির্ভর করে, এবং যোগ্যতা নির্ধারণে যেখানে রয়েছে ন্যায়নীতি, নিঃস্বার্থপরতা, ইত্যাদি গুণাবলীর সমাবেশ। এছাড়া প্রস্তাবিত পদ্ধতি ধীরে ধীরে যেন একনায়কতন্ত্র বা স্বৈরতন্ত্রের দিকে চলে না যায় তার জন্যও যথেষ্ট রক্ষাব্যবস্থা রয়ে গেছে খুব সহজ অপসারণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। তারপরও অবস্থা বিশেষে নতুন কোন ব্যবস্থা নিতে হলে সহজেই পদ্ধতিগুলো সংস্কারের ব্যবস্থা থাকবে।

আরও কিছু কথা

ভোটের মাধ্যমে প্রচলিত গণতন্ত্রকে আমরা জনগণের প্রতিনিধিত্বমূলক বলে থাকি। এ দর্শনের ভিত্তি হচ্ছে যে সবাই একেবারে সমান, তাই প্রতিটি ব্যক্তিই সেখানে প্রতিনিধি হবার যোগ্য। যেহেতু সবাই মিলে রাষ্ট্র চালানো সম্ভব নয় তাই নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু তার পরই দেখছি এ প্রতিনিধিবৃন্দকে আমরা জননেতা আখ্যা দিচ্ছি। জিনিসটি বিকৃত হয়ে গেল না কি?

আর একটি বিষয় হল যে দলভিত্তিক গণতন্ত্র চালু হবার আগেই রাজতন্ত্রের মাধ্যমে পাশ্চাত্যের দেশগুলো ধনসম্পদের পাহাড় গড়ে নিয়েছিল, যার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজনগুলোকে তার পূরণ করে দিতে পেরেছিল, এবং এখনও পারছে। এর ফলে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ভুলের টানাপোড়েন থাকলেও সাধারণ মানুষের জীবন কোনভাবে উতরিয়ে যায়। তাই সাধারণ মানুষ সরকার ব্যবস্থায় কি হল বা না হল তা নিয়ে তেমন উদ্দিগ্ন নয় কোনভাবেই।

পাশ্চাত্য থেকে আসা আধুনিক গণতন্ত্র ও আধুনিক অর্থনীতি শেখায় যে প্রতিটি গোষ্ঠী যদি নিজের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করে তবে পরিশেষে ক্ষমতা ও সম্পদের সমান বিভাজন হবে। কিন্তু চিন্তা করুন, জঙ্গলে বাঘ, সিংহ, শেয়াল আর হরিণ সবাই যদি গোষ্ঠীগতভাবে নিজ নিজ অধিকার আদায়ে সংগ্রাম করে, তবে কার ভাগ্যে কতভাগ জুটবে? আজকে আধুনিক গণতন্ত্র ও আধুনিক মুক্তবাজার অর্থনীতি কি ফলাফল

দিয়েছে? পৃথিবীতে সম্পদের বৈষম্য বেড়েই চলেছে, মানুষে মানুষে বিবাদ ও হানাহানি আরও বেড়েছে, দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার বেড়েই চলেছে। একটু চিন্তা করুন, মানুষের ভিতরে মনুষ্যত্ব ও পশুত্ব দুটি চরিত্রই রয়েছে। পরিবেশ তাকে এর যে কোন একটির প্রভাব বলয়ে নিয়ে যেতে পারে। আগে যেমন বলেছি যে একই ফল বিক্রেতাকে বিশ্বাস করে কথা বলার ফলে সে আমার সঙ্গে বিশ্বাসযোগ্য আচরণ করছে, কিন্তু আর একজন যে তাকে বিশ্বাস করে নি, তাকে সে ঠকিয়ে দিয়েছে। যদি মানুষকে তার নিজের স্বার্থ আদায়ের কথা বলা হয় তবে তা তাকে স্বাভাবিকভাবেই পশুত্বের দিকে নিয়ে যাবে। আর যদি প্রত্যেককে নিজ স্বার্থ ত্যাগ করে অপরের স্বার্থ আদায়ের জন্য উদ্বুদ্ধ করা যায় তবেই তার মধ্যকার মানবিক গুণগুলি জেগে উঠবে। তাই মানবিক সমাজ তৈরী করতে গেলে মানবিক গুণাবলী উজ্জীবিত করার দর্শন ও ব্যবস্থা তার পদ্ধতির মধ্যে নিহিত থাকতে হবে। আধুনিক রাষ্ট্র, সমাজ ও অর্থনীতি ব্যবস্থার যারা রূপকার, তাদের মধ্যে এ জীবন বোধটির অভাব দেখা যায়। তারা ধরে নিয়েছেন যে মানুষ মাত্রই খারাপ, তাকে বিশ্বাস করা যাবে না। তাই পাশ্চাত্য থেকে আসা এসব ব্যবস্থার মূলে যে দর্শন কাজ করেছে তা হল যে সমাজে অবিশ্বাস আর দুর্নীতি থাকবেই, এবং নেতাদের মধ্যেও তা থাকবে। জটিল নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে একটি সীমার মধ্যে ধরে রাখতে হবে। “Mistrust, Check and Balance” হচ্ছে এ পদ্ধতির মূল দর্শন। আর তার জন্যই আজকে পৃথিবীতে mistrust বা অবিশ্বাসই কেবল ছড়াচ্ছে, ফলে পৃথিবী অনাবাসযোগ্য হতে চলেছে। ব্যক্তি বা রাষ্ট্র পর্যায়ে ধনী গরীব কেউই আর এখন ভাল থাকতে পারছে না।

আমার আর একটি পর্যবেক্ষণ হল যে শীতের দেশের মানুষগুলোকে এক কালে দলবদ্ধভাবে পশু হত্যা করে জীবন ধারণ করতে হয়েছে, তার চামড়া গায়ে দিতে হয়েছে। তাই বেঁচে থাকার জন্য দলবদ্ধ থাকার মানসিকতা তাদের অস্থিমজ্জায় মিশে আছে। দলের নেতার যে কোন কথা বা আদেশ সবাই চোখ বন্ধ করে মেনে নেয়, কদাচিৎ তার বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করে। এর ভাল দিকটি হচ্ছে যে দেশে বিশৃংখলা হয় খুব কম। দলনেতার নির্দেশ শুনে তারা বিশ্ব বিজয় করেছে। আবার কঠিন জীবনের সম্মুখীন হওয়াতে প্রযুক্তিগত আবিষ্কার ও উন্নয়নও এইসব দেশে বেশী হয়েছে, যার ফলে আজ তারা শিল্পোন্নত ধনী দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। তবে খারাপ দিকটি হচ্ছে যে জনগণকে ঠকানোর মত, অথবা পৃথিবীর অন্য দেশের মানুষকে অত্যাচার-হত্যা করার মত কোন অনৈতিক কাজ করলেও নেতৃত্বের বিরুদ্ধে জনগণ সহজে সোচ্চার হয় না, যদি না তা সরাসরি তাদের নিজেদের বাঁচামরার কারণ না হয়ে দাঁড়ায়। তাই সেখানে একটি ভুল ব্যবস্থার মাধ্যমে মুষ্টিমেয় সুযোগসন্ধানী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সাধারণ জনগণকে ভুলিয়ে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে, তেমনি পারে গোটা পৃথিবীকে অনাবাসযোগ্য করে তুলতে। উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় পাশ্চাত্যে প্রচলিত দলভিত্তিক গণতন্ত্র কেন কিছুটা হলেও সফল হয়েছে বলে মনে হয়।

পক্ষান্তরে বাংলাদেশের মত গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অতীত কালে একজন মানুষ বনে-জঙ্গলের ফলমূল খেয়ে সহজে জীবন ধারণ করতে পারত। চাষ-বাসও খুব সহজে হত। এ জন্য গত কয়েকশতকে এদেশে প্রযুক্তিগত আবিষ্কার ও আধুনিক প্রযুক্তিভিত্তিক শিল্পায়ন হয় নি বললেই চলে। তার উপর যখন পাশ্চাত্যের ঔপনিবেশিক শক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে এদেশের মানুষকে শিল্পখাত থেকে সরিয়ে কৃষির উপর নির্ভরশীল করে তুলল, তখন এক বিরাট অর্থনৈতিক টানাপোড়েন এর সৃষ্টি হল যার জের আমরা আজকেও টানছি। অপরদিকে চাষ বাসে দলবদ্ধ হবার তেমন প্রয়োজন নেই। তাই এদেশে মানুষের ব্যক্তিস্বাভাব্য অনেক বেশী, এরা প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে চায়। এ জন্য কোন নেতা নিজের স্বার্থ আদায় করার উদ্দেশ্যে এ দেশের মানুষকে ভুল বুঝিয়ে বেশী দূর এগোতে পারে না। আজকে হয়ত যে নেতাকে জনগণ দেবতার আসনে তুলে ধরছে, তার কোন অন্যায় আচরণ দেখতে পেলে কালই জনগণ তাকে প্রত্যাখ্যান করবে। এ জন্য যে কোন নতুন ধারণা পরীক্ষা করে দেখার জন্য বাংলাদেশই সবচেয়ে উপযুক্ত বলে মনে হয় আমার কাছে।

প্রচলিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কোথায় সম্ভব? যেখানে প্রতিটি মানুষের শিক্ষা, দীক্ষা, মর্যাদা, অর্থনৈতিক অবস্থা, সম্মান সব একদম সমান। একটু কমবেশী হলেই একটু বেশী ক্ষমতাসীন যারা, তারই বেশী সুযোগ সুবিধা নিয়ে সমাজে বৈষম্য সৃষ্টি করবে। এমন কি সমাজে পুরুষ ও মহিলাদের শারীরিক শক্তির পার্থক্য রয়েছে।

তাই সেখানেও দেখা যাবে পুরুষরা নিয়ম কানুন এমনভাবে করে নিয়েছে যেন তা মহিলাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যায় ও বৈষম্য সৃষ্টি করে। মানুষের হাজার বছরের ইতিহাসে এর সরাসরি ফলাফল কি আমরা দেখতে পাইনি ? তাই বলতে গেলে প্রচলিত গণতান্ত্রিক মূল জীবন দর্শনটিই ভ্রান্ত, যার কারণে সে পৃথিবীতে শান্তি ও সম্প্রীতি তৈরী করার পরিবর্তে কেবল বিভেদ ও হানাহানিই বাড়িয়ে দিচ্ছে। আপাতঃ দৃষ্টিতে কারও কারও নিজের দেশের জনগণের জন্য ভালই চলছে মনে হয়, কিন্তু তার শক্তি আশে পাশের দেশ ও জাতিগুলোর জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে, সারা পৃথিবীই আজ যেন বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়ছে।

সমাজের প্রয়োজনে যে পদ্ধতিই নেয়া হোক না কেন, তার লক্ষ্য থাকবে যেন প্রতিটি মানুষের আয়, মর্যাদা, শিক্ষা ইত্যাদির মধ্যে সমতা আনার। পুরোপুরি হয়ত কখনোই আসবে না, কিন্তু লক্ষ্য নির্দিষ্ট থাকলে বহুদূর যাওয়া সম্ভব। হাজার বছরের ভুল নীতিমালার কারণে এ লক্ষ্য বার বার লঙ্ঘিত হয়েছে, মানুষে মানুষে আকাশচুম্বী বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে। তবে বর্তমানের প্রতাণামূলক অর্থনীতির মত দরিদ্রকে একদিকে শোষণ করে অপরদিকে সাবসিডী, দরিদ্র-ভাতা, ইত্যাদি করুণা দেখানো কিছু ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে যেন তা না করা হয়। প্রতিটি মানুষের মেধা, উদ্ভাবনী ক্ষমতা ও নিজের হাতের দক্ষতা ব্যবহার করে অর্থোপার্জনের স্বাধীনতার পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে তা করতে হবে। বর্তমানে বিভিন্ন কর ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে দরিদ্রদের এ স্বাধীনতাকে খর্ব করা হয়েছে, আবার ধনীরা এ বৈষম্য ধরে রাখার জন্য কোন না কোন পন্থায়, কখনও মুক্ত বাজারের মত সুন্দর সুন্দর কথার ফানুস তৈরী করে কৌশলে নিয়ন্ত্রণ করছে যেন আয় বৈষম্য কোনভাবেই না কমে। তাই এ ব্যাপারে বিশেষ আন্তরিকতা নিয়ে, সবার সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে নীতিমালা ও কাজের পদ্ধতি নির্ধারণ করতে হবে, আর সার্বক্ষণিক ফলাফল পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিবর্তন আনতে হবে।

মোদ্দা কথা, এমন একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা আমরা খুঁজছি যে ব্যবস্থা হবে জনকল্যাণমুখী, যা হবে মানুষের বিশ্বাস ও সুন্দর গুণগুলোর উপর নির্ভরশীল, যা দেশের প্রতিটি মানুষের সুন্দর জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাবে ও তা বাস্তবায়ন করবে।